কাব্যগ্রন্থ

আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

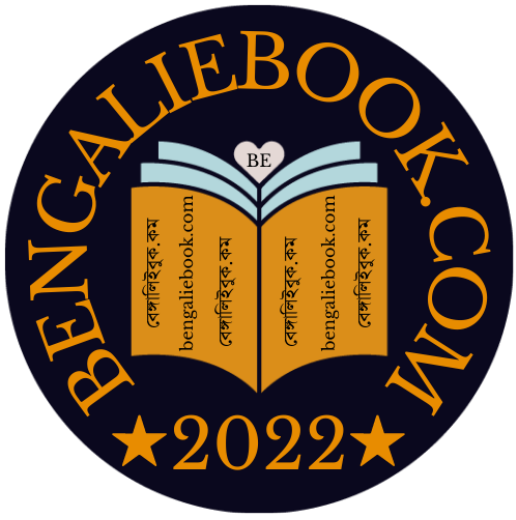

সূচিপত্র

অচেনা.....6
অনর্থক নয়.....6
অপমান এবং নীরাকে উত্তর.....8
অবেলায় 9
অমলের স্ত্রীর জন্য ১০
অসমাপ্ত ১১
অসুখের ছড়া ১২
আটাশ বছরে ১৩
আমার কয়েকটি নিজস্ব শব্দ.....১৫
আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়.....১৫
আমার ছায়া.....১৬
আমি ও কলকাতা.....১৭
আমি কিরকম ভাবে বেঁচে আছি ১৯
আর্কেডিয়া ২১
এই হাত ছুঁয়েছিল ২২

এক সন্ধেবেলা আমি ২৩
একই স্বপ্ন দু'জনে দেখেছি ২৪
একটি কবিতা লেখা ২৬
একবার হাসপাতালে যাও ৩০
এবার কবিতা লিখে ৩১
কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্ন ৩২
ক্লান্তির পর ৩৩
কয়েক মুহূর্তে ৩৪
খিদে ৩৫
ঘুম ৩৬
চোখ বাঁধা ৩৭
চোখ বিষয়ে ৩৮
জুয়া ৩৯
জ্বলন্ত জিরাফ ৪১
তিন ঘণ্টা বিচ্ছেদ ৪২
তুমি শব্দ ভেঙেছিলে ৪৩
দাঁতের ব্যথায় ভুগছেন একজন দার্শনিক ৪৪
দু'জনের কাছে ঋণ ৪৫

দুপুরে রোদ্দুরে..... 46
দেখা হবে..... 47
দ্বিধা..... 48
না লেখা কবিতা..... 49
নারী ও নগরী..... 50
নির্বাসন..... 51
নিয়তি..... 52
নীরা ও জীরো আওয়ার..... 53
নীরা তোমার কাছে..... 56
নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা..... 57
নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা..... 58
পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না..... 60
পৌঁছোনো যাবে না..... 62
প্রত্যেক তৃতীয় চিন্তা..... 62
প্রেমবিহীন..... 64
বহুদিন পর প্রেমের কবিতা..... 65
বায়ু, তুমি..... 67
বিড়াল..... 67

বড় বেশি ৬৭
ভ্রমণ ৬৮
মহারাজ, আমি তোমার ৭০
মালতী ৭১
মায়াজাল ৭১
মুখ দেখাদেখি ৭২
মৃত্যুদণ্ড ৭৩
মেয়েদের জন্য ভুল ছন্দে ৭৪
রাখাল ৭৫
রাত্রির বর্ণনা ৭৬
শব্দ ১ ..... ৭৭
শব্দ ২ ..... ৭৮
শুধু কবিতার জন্য ৭৯
শেষ যাত্রী ৭৯
সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী ৮০
সাবধান ৮১
স্বপ্ন, একুশে ভাদ্র ৮২
স্মৃতির প্রতি ৮৩

হঠাৎ নীরার জন্য ৪ 4
হাওয়া এসে..... ৪ 5
হিমযুগ ৪ 6

অচেনা

তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে...
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি ফুলের কাছে ঋণী রইলে...
বাসের অমন ভিড়ের মধ্যে মেয়েটা
আমাকে এক লাইন কবিতা দিয়ে হঠাৎ নম্র-নেত্রপাতে
বেলগাছিয়ায় নেমে গোল রক্ত গোলাপ হাতে
বাকিটা পথ রইলো শুধু ঘামের গন্ধ, ব্রিজের ধুলো
তোমার হাতে গোলাপ, তুমি আমার কাছে ঋণী রইলে।

অনর্থক নয়

বেয়ারা পাঠিয়ে কারা টাকা তোলে ব্যঙ্ক থেকে?
আমি তো নিজের সইটা এখনো চিনি না
বিষম টাকার অভাব!নেই। শুধু হৃৎপিন্ড হাওয়া টেনে নেয়ে
হাসি কুলকুচো করি। মাথায় মুকুট নেই বলে
কেউ ধার দিতেও চায় না।
কিছু টাকা জমা আছে ব্লাড ব্যাঙ্কে। সামান্য।
কাঁটা ছাড়ানো মাছের মতন
গদ্য লিখলে ক্যাশ আসে। পারি না। কবিতায় দশ টাকা
তাই বা মন্দ কি, কত দীর্ঘ দিন বন্ধুদের টেবিলে বসিনি।
কতই তো দিলে বিধি- চোখ, নাক, হাত, ডিগ্রি, জিভ, ঘোরাঘুরি
কয়েকখানা বড় সাইজ উপন্যাস শেষ করার সামর্থ দিলে না?
শিল্পের জননী নাকি দুঃখ? সর্বনাশ, আমার তো কোনো দুঃখ নেই।

খুব গোপনে জানাচ্ছি
(একমাত্র টাকা কিংবা দুঃখ না-থাকার-দুঃখ যদি গণ্য হয়!)
কে কোথায় পায়নি প্রেম, এর সঙ্গী ভোগ করছে ওর সন্ধেবেলা
এসব চমৎকার লাগে।
কে যেন আমায় কথা দিয়েছিল! কথা সাঁতরে গেছে অন্ধকারে-
ভয়ঙ্কর জানলা খুলে রাত দুটোয় এক ঝলক আলো এসে পড়ে
মাঝে মাঝে চোখে মুখে। অমনি চেঁচিয়ে উঠি উল্লাসে মুখ তুলেঃ
বিশ্বাসঘাতিনী ভাগ্যে হয়েছিলে নারী, তাই বেঁচে থাকা এত রোমাঞ্চের
নেশাফেশা কিছু নেই, দুঃখ নেই, গোপনে চুপচাপ বাঁচতে চাই
তাও কত শক্ত দেখেছি, চারবেলা অদ্ভুত চাকরি, ঘুমহীন চোখে
কবিতার আরাধনা
কেন এই আরাধনা? ওভারটাইম দশা টাকা?
ছোট ছোট ঝাল লঙ্কা কিংবা ঠিক টিনের চিরুনির মতো রেদে
পঞ্চাশটা কাবুলিকে স্বপ্ন দেখে আজ দুপুরে চমকে গেছি ট্রামে।
কোর্বন স্ট্রীটের মোড়ে বুড়ো দরবেশ চাইলো অমরত্ব খুবই আন্তরিক
কপালে কুষ্ঠের কাদা। তিনটে নয়া পয়সা দিয়ে মানুষের মতো অভিমান
সংকেতবিহীন কণ্ঠে জানালুমঃ
যদি রাস্তা চিনতে পারো, যাও হে অনন্তধামে সন্ধের আগেই
ঈশ্বরের পাশে একটি তোমার জন্যেই খালি আসন রয়েছে আমি জানি
পরমহূর্তেই আমি পামের পাগলীর কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে-
তিনটে পয়সা দাও ভাই আজ আমাকে
গাড়ি ভাড়া নেই বহুদূরে যেতে হবে।
মায়ের তোরঙ্গ থেকে সিঁদুরের গুড়ো ঝেড়ে আজও
সম্রাট পঞ্চম জর্জ কাটামুন্ডে সহাস্য বয়াস
যাও মাছের বাজারে ইয়োর ম্যাজিস্টি , পুঁইশাক, সিগারেট, কুমড়োয়

দেখি কতো তোমার মুরোদ! সব ম্যাজিক ভুলে গেছি-
একত্রিশ হারিখে দেখছি অ্যালয়ের কুশব্দ ইয়ার্কি
এখানে ওখানে নদী- কালো জল, প্রত্যহ স্নান সেরে বহু পবিত্র গন্ডার
চৌরঙ্গীর চতুর্দিকে হুটোপুটি করে- হাসে, মেয়েদের খোলা তলপেটে
সুড়সুড়ি দেয় কিংবা ঠোঁট চাটে, নুন ঝাল মিশিয়ে
প্রথম শীতের এই মনোরম সন্ধ্যাগুলি কাঁটা চামচে দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে
সুস্বাদে চিবিয়ে খায়। সমস্ত রাস্তাই আজ ভিড়ে ভর্তি ভিড়ে
ভর্তি, অসম্ভব, আমি হঠাৎ কোথায় আজ হারালুম আমার নিজস্ব
গোপন প্রস্থান পথ- এ দুর্দিনে ফটকার বাজারে!

অপমান এবং নীরাকে উত্তর

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে, নীরা, কেন হেসে উঠলে, কেন
সহসা ঘুমের মধ্যে যেন বজ্রপাত, যেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, নীরা, হেসে উঠলে, সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে কেন সাক্ষী কেন বন্ধু কেন তিনজন কেন?
সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন হেসে উঠলে সাক্ষী রইলো বন্ধু তিনজন!

একবার হাত ছুঁয়েছি সাত কি এগারো মাস পরে ঐ হাত
কিছু কৃশ, ঠাণ্ডা বা গরম নয়, অতীতের চেয়ে অলৌকিক
হাসির শব্দের মতো রক্তস্রোত, অত্যন্ত আপন ঐ হাত
সিগারেট না-থাকলে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ঘ্রাণ নিতুম
মুখ বা চুলের নয়, ঐ হাত ছুঁয়ে আমি সব বুঝি, আমি
দুনিয়ার সব ডাক্তারের চেয়ে বড়, আমি হাত ছুঁয়ে দূরে

ভ্রমর পেয়েছি শব্দে, প্রতিধ্বনি ফুলের শূন্যতা–

ফুলের? না ফসলের? বারান্দার নিচে ট্রেন সিটি মারে,
যেন ইয়ার্কির
টিকিট হয়েছে কেনা, আবার বিদেশে যাবো সমুদ্রে বা নদী...
আবার বিদেশে,
ট্রেনের জানালায় বসে ঐ হাত রুমাল ওড়াবে।
রাস্তায় এলুম আর শীত নেই, নিশ্বাস শরীরহীন, দ্রুত
ট্যাক্সি ছুটে যায় স্বর্গে, হো-হো অট্টহাস ভাসে ম্যাজিক-নিশীথে
মাথায় একছিটে নেই বাষ্প, চোখে চমৎকার আধো-জাগা ঘুম,
ঘুম! মনে পড়ে ঘুম, তুমি, ঘুম তুমি, ঘুম, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কেন ঘুম
ঘুমোবার আগে তুমি স্নান করো? নীরা তুমি, স্বপ্নে যেন এরকম ছিল...

কিংবা গান? বাথরুমে আয়না খুব সাঙ্ঘাতিক স্মৃতির মতন,
মনে পড়ে বস স্টপে? স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্নে–স্বপ্নে, বাস-স্টপে
কোনোদিন দেখা হয়নি, ও সব কবিতা! আজ যে রকম ঘোর
দুঃখ পাওয়া গেল, অথচ কোথায় দুঃখ, দুঃখের প্রভূত দুঃখ, আহা
মানুষকে ভূতের মতো দুঃখে ধরে, চৌরাস্তায় কোনো দুঃখ নেই, নীরা
বুকের সিন্দুক খুলে আমাকে কিছুটা দুঃখ বুকের সিন্দুক খুলে, যদি হাত ছুঁয়ে
পাওয়া যেত, হাত ছুঁয়ে, ধূসর খাতায় তবে আরেকটি কবিতা
কিংবা দুঃখ-না-থাকার-দুঃখ...। ভালোবাসা তার চেয়ে বড় নয়!

অবেলায়

আমার নিঃসঙ্গ জাগা ভাঙে না কোথাও ঘুমঘোর
অতিরিক্ত অবিশ্বাস মানুষের পাশাপাশি হাঁটে

মানুষ না প্রতিবিম্ব? অবিশ্বাস না মায়ার শোক?
আমার নিঃসঙ্গ জাগা অবেলায় অস্থির ললাটে
গভীর ধ্বনির মধ্যে ভেসে রয়, অফুরন্ত অলীকের পাশাপাশি হাঁটে।

অমলের স্ত্রীর জন্য

আমি খুব দূর, দূর দেশ থেকে অলক্ষ্যে বাণ ছুঁড়ি
তুমি কাছে এসে এক কণা কস্তুরী
তুলে নিলে করকমলে
সখী, আজ আর আমাকে বলোনা নিষ্ঠুর হতে
আমাকে বলে না অমলের
শবযাত্রায় কাঁধ দিতে, আমি আজ গঙ্গার স্রোতে
থুতু ফেলবো না, দেখো এই মুখ, এ কি নিষ্ঠুর মানুষের মুখ?
আমার শরীর, দেখো, চেয়ে দেখো এ কি মনে হয়
বারুদে ভর্তি সিন্দুক?
দেয়ালের পাশে দাঁড়ালে তোমাকে খুবই মানায়
খুব বড়ো ঘর, আধো-নীল কোনো দেয়ালে–
তুমি নও কিছু রূপসী, তোমার চোখ ছোট,
শুধু হঠাৎ কখনও খেয়ালে
হেসে ওঠো পাগলিনীর মতন, একলা ঘরের দেয়ালে–
রোদ এসে পড়ে চিবুকে তোমার দুঃখ জানায়
দুঃখে দেয়ালে দাঁড়ালে তোমাকে খুবই মানায়
দুঃখ তোমার গন্ধের মতো ফেটে পড়ে ঐ দেয়ালে–
আমাকে বলো না নিষ্ঠুর হতে, আমাকে বলো না অমলের
মৃত্যু সইতে, মৃত্যু আমায় অসুখ দেয় না কাঁপায় না বুক

সখী, আমি আজ তোমার ও করকমলের
কস্তুরী নোবো, দেখো এই মুখ এ কি নিষ্ঠুর মানুষের মুখ?
মৃত্যু আমাকে অমৃত দেয় না। কাঁপায় না বুক
আমি আজ কাছে দাঁড়িয়ে দেখবো তোমার অসুখ।

অসমাপ্ত

মেঘের সঙ্গে কথা বলিনি, তাই বিস্মরণে দুঃখ নেই
পাতা পোড়ানো গন্ধ মনে পড়ে, ছেলেবেলার পাতা পোড়ানো
গন্ধ, কলকাতায় পাতা পোড়ে, গন্ধ পাই না-

কেউ কি ময়দানে গিয়ে গান গেয়ে কুকর্ম করেনি?
আমি রক্ষী ছিলাম, আমি খাকি পোশাকের মতো মুখে
চুপ করে গাছের পাশে দাঁড়াতে দেখেছি। হাওয়ায়
মেয়েদের নিশ্বাস দু'একজন আলাদাভাবে চিনতে পারতো
এ ছাড়া সিংহাসন
হারানো দুঃখে ভোরবেলা সম্রাটের প্রেত হয়ে যাওয়া
এ ছাড়া সিংহাসন
পেয়ে প্রেতের কলঙ্কহীন সম্রাটের সারারাত্রি জুড়ে।
যৌবন আসতে বড় দীর্ঘ সময় লাগে, প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি
ঊরু ও জিভের ঘোরতর দ্বন্দ্ব যেদিন শেষ হয়
তার পরেই বিস্মরণ, আগে সাদা মেঘ, আমি মেঘের সঙ্গে
কখনো কথা বলিনি। ময়দানের অন্ধকারে নিজেও খাকি
পোশাকের মতো মুখে দাঁড়িয়েছিলাম, চেয়ে দেখেছি বিরক্তিকর
রাত্রির রাস্তা-বিচার বিভাগীয় তদন্তের মতো নির্বোধ দীর্ঘ।

‘তুমি কেমন আছো? কতদিন দেখিনি তোমাকে–’
এ কথা কেউ শৈশবে শোনে না, শুধু এরই জন্য
অপেক্ষা যৌবনের, অন্ধকারে গাছের পাশে-ভালোবাসা
আসে ও চলে যায়
আমি ঘুমের মধ্যে অনেক ভালোবাসা বেসেছি
ও ভালোবাসা ভেঙে যায়
যারা ভালোবাসে না তারা শরীরে সুখী হয়ে পেনশন পায়
খামের চিঠি নানা ঠিকানায় ঘুরলে কেউ অভিমান করে না
পেটে আগুন জ্বলে, গ্রন্থের পাতা পোড়ে, গন্ধ পাই না।
প্রথম নরক দর্শনের আগে জেগে ওঠে ছেলেবেলার গন্ধ
‘তুমি কেমন আছো? কতদিন দেখিনি তোমাকে–’
হঠাৎ হুহু করে ওঠে, বুক মুচড়ে অসম্ভব দীর্ঘ নিশ্বাস
ছুটে আসে-মনে হয় ব্যর্থ অন্ধকারে দাঁড়ানো-
সন্দীপন অসুখ দেখেছিল, আমি অন্ধকারে অন্ধকার ছাড়া কিছুই
দেখিনি।

অসুখের ছড়া

একলা ঘরে শুয়ে রইলে কারুর মুখ মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না
চিঠি লিখবো কোথায়, কোন মুন্ডহীন নারীর কাছে?
প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে না চোখের আলো মনে পড়ে না
ব্লেকের মতো জানলা খুলে মুখ দেখবো ঈশ্বরের?

বৃষ্টি ছিল রৌদ্র ছায়ায়, বাতাস ছিল বিখ্যাত
করমচার সবুজ ঝোপে পূর্বকালের গন্ধ ছিল

কত পাখির ডাক থামেনি, কত চাঁদের ঢেউ থামেনি
আলিঙ্গনের মতো শব্দ চোখ ছাড়েনি বুক ছাড়েনি
একলা ছিলুম বিকেলবেলা, বিকেল তবু একা ছিল না
একটা মুখ মনে পড়ে না মনে পড়ে না মনে পড়ে না।

এত মানুষ ঘুমোয় তবু আমার ঘুমে স্বপ্ন নেই
স্বপ্ন না হয় স্মৃতি না হয় লোভ কিংবা প্রতিহিংসা
যেমন ফুল প্রতিশোধের স্পৃহায় আনে বুকের গন্ধ
রমণী তার বুক দেখায়, ভালোবাসায় বুক ভর না
শরীর নাকি শরীর চায়, আমার কিছু মনে পড়ে না
মনে পড়ে না মনে পড়ে না- মেঘলা মতো বিস্মরণ
যেমন পথ মুখ লূকিয়ে ভিখারিণীর কোলে ঘুমোয়।

বৃক্ষ তোমার মুখ দেখাও, দেখি আকাশ তোমার মুখ
এসো আমার গতজন্ম তোমায় চেনা যায় কিনা
কোথাও নেই মুখচ্ছবি এ কী অসম্ভব দৈন্য-
আমার জানলা বন্ধ ছিল উঠেও ছিটকিনি খুলিনি
জানলা ভেঙে ঢোকার বুদ্ধি ঈশ্বরেরও মনে এলো না?
আমায় কেউ মনে রাখেনি, না ঈশ্বর না প্রতিমা.....

আটাশ বছরে

মৃত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে চোখে চোখে কথা শেষ হয়
তুমি কিংবা আপনি বলবো মনেও পড়ে না
জানলায় বাদুড় এসে হেসে যায় দগ্ধ ভোরবেলায়
বিবাহিত রমণীরা সিঁড়ির উপর থেকে চকিতে দাঁড়িয়ে

যেন বহু কষ্ট কেনা
মুণ্ডহীন হাসি দিয়ে চলে যায় কুল বারান্দায়,
এখন প্রত্যেক দিন দাড়ি না কামালে আর বাঁচে না সম্মান,
রক্তের সমুদ্রে এক স্বীপ আছে সেখানে স্টিমার ছাড়ে সঠিক দশটায়।

সকালে কলম দিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙেছি একটা ভিমরুলের বাসা
বহুক্ষণ একা একা ঘুরে ঘুরে উড়ে গেল করুণ ভিমরুল
(ওদের ললাটে দেখছি শিল্পী মার্কা দুঃখের জড়ুল!র
বিশাখার জন্মদিনে সন্ধেবোলা জমবে এক বিষম তামাশা
সেখানে ভিমরুল-তত্ত্ব জানতে হবে, অথবা হাজির হবো
ছোকরা অধ্যাপকের বাড়িতে
এবং লুকিয়ে আমি সিগারেট জ্বালতে গিয়ে অতিশয় যত্নে সাবধানে
সদ্য কেনা বেডকভার নিশ্চয় পুড়িয়ে আসবো ওর, অতর্কিতে।

স্টোভের শব্দের মতো কি যেন রয়েছে অবিরল এই বুকের মাঝখানে।
তাস খেলতে কৃপা লাগে, বিরলে সময় পোড়ে সিগারেটে শুধু কিছুক্ষণ
জেতায় আনন্দ নেই, হেরে গেলে ক্রোধ আসবে কবে?
কুমারীরা চিঠি লেখে, আমার হৃদয়ে নেই রক্তের ক্ষরণ
বাথরুমে নগ্ন নারী হঠাৎ দেখলে আর শরীর কাঁপে না
জানলার পুরোনো শিক ভেঙে ভেঙে সুর আসে উদাস মন্ত্রের–
মৃত্যুর অতীব কাছে দিন কাটিয়েছি আমি অনেক উৎসবে।
দুমড়ানো, পায়ের নিচে পড়ে থাকে, পাণ্ডুলিপি, শিয়রে গ্রন্থের
অগোছালো স্তূপ থেকে ভেসে আসে শবের দুর্গন্ধ।

সিঁড়িতে বিষম অন্ধকার, আঃ, ঘড়ির শব্দের মতো এমন কুৎসিত
আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে-অমিত, অমিত!
তোমার বাড়িতে আজ থাকতে দেবে? চলে যাবো কাল ভোরবেলায়

অতীশ আমল ওরা-লুকিয়েছে সংসারের রুক্ষু ঝামেলায়
পত্নীর স্তনের বেঁটা থেকে ঠোঁট তুলে এনে মধ্যরাতে এখনও অমিত
পুরনো বন্ধুর মুখ তোমারও কি দেখতে সাধ নেই?

আমার কয়েকটি নিজস্ব শব্দ

পরিত্রাণ, তুমি শ্বেত, একটুও ধূসর নও, জোনাকির পিছনে বিদ্যুৎ,
যেমন তোমার চিরকাল
জোনাকির চিরকাল; স্বর্গ থেকে পতনের পর
তোমার অসুখ হলে ভয় পাই, বহু রাত্রি জাগরণ- প্রাচীন মাটিতে
তুমি শেষ উত্তরাধিকার। একাদশী পার হলে-তোমার নিশ্চিত পথ্য হবে।
আমার সঙ্গম নয় কুয়াশায় সমুদ্র ও নদী;
ঐ শব্দ চতুষ্পদ, দ্বিধঅ, কিছুটা উপরে, সার্থকতা যদি উদাসীন;
বিপুল তীর্থের পূণ্য-নয়? সর্বগ্রাস
যেমন জীবন আর জবিনী লেখক।
প্লেনের ভিতরে কান্না এক দেশ থেকে অন্য দেশে উড়িয়ে আনি
একই বুজের মধ্যে।।

আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়

যে পান্থনিবাসে যাই দ্বার বন্ধ, বলে, “ঐ যে রুগ্ন ফুলগুলি
বাগানে রয়েছে শুধু, এখন বসবেন?’ কেউ মুমূর্ষু অঙ্গুলি
আপন উরসে রেখে হেসে ওঠে, পাতা ঝরানো রহাসি, ‘এই অবেলায়
কেন এসেছেন আপনি, কী আছে এখন? গত বসন্ত মেলায়
সব ফুরিয়েছে, আর আলো নেই, দেখুন না তার ছিঁড়ে গেছে, সব ঘরে
ধূলো, তালা খুলবে না এ জন্মে; পরিচারিকার হাতে কুষ্ঠ!’ ভগ্ন কণ্ঠস্বরে

নেবানো চুল্লীর জন্য কারো খেদ, কেউ কেউ আসবাববিহীন
বুকের শীতের মধ্যে শুয়ে আছে, মৃত্যু বহুদূর জেনে, চৈত্রের রূক্ষ দিন
চিবুক ত্রিভাঁজ করে, প্রতিটি সরাইখানা উচ্ছিষ্ট পাঁজর ও রক্তে
ক্লিন্ন হয়ে আছে
বাগানে কুসুমগুলি মৃত, গন্ধহীন, ওরা বাতাসে প্রেতের মতো নাচে।
আমার আগের যাত্রী রুপচোর, তাতার দস্যুর মতো পেরোয়া
কব্জি শক্তিধর
অমোঘ মৃত্যুর চেয়ে কিছু ছোট, জীবনের প্রশাখার মতো ভয়ঙ্কর
সেই গুপ্তচর পান্থ আগে এসে ছেঁচে নিলো শেষ রূপ রস-
ক্ষণিক সরাইগুলি হায়! এখন গ্রীবায় ছিন্ন ইতিহাস, ওষ্ঠে,
চোখে, মসীলিপ্ত পুঁথির বয়স।
আমার খানিকটা দেরি হয়ে যায়, জুতোয় পেরেক ছিল,
পথে বড় কষ্ট, তবু ছুটে
এসেও পারি না ধরতে, ততক্ষণে লুট শেষ, দাঁড়িয়ে রয়েছে সব
ম্লান ওষ্ঠপুটে।

আমার ছায়া

সতীশের মৃত্যু হলো, জিভ দিয়ে চেটেছিল শ্বেতবর্ণ বিষ।
আমরা সব বেঁচে আছি ঠিকঠাক, কী আশ্চর্য দেখা হে সতীশ,
ব্যস্ত হয়ে কাজ করছি উদ্ভিদের মতো এক লোবরেটরিতে
রোদ্দুর মেশাচ্ছি দেহে প্রতিদিন, ঝরে যাইনি বর্ষা কিংবা শীতে।
তোমার নবোঢ়া পত্নী কিস্তি হারে শেলাইয়ের কল কিনেছে কাল
দিনরাত ঘর্ঘর শব্দ, টুকরো কাটা ছিটকাপড়, নানান জঞ্জাল
রোজ তাকে ঘিরে থাকবে, সময়ের দাম পাবে গুনে বারোমাস,

আমিও এক-একদিন হঠাৎ হাজির হয়ে করে বসবো চায়ের ফরমাশ।
একটা হাত টেনে তার রেখা গুনে ভবিষ্যৎবানাবো নির্ভীক,
কপালে অশেষ দুঃখ! বললে, তুমি টিকটিকির সঙ্গে মিশে বলবে ঠিক ঠিক!
ফোটো হয়ে ঝুলে থাকবে, হা সতীশ, নাকের উপর বসবে মশা
নিতান্ত ডাক্তারি মতে আমি ও তোমার পত্নী করবো শোয়া-বসা।
অধুনা স্বাধীন নারী আমাকে ছুয়েই হয়তো তোমার মৃত্যুর কথা বলবে
একদিন
তোমার জীবন ছিল কী শীতল, মানুষেরই মতো, তবু মনুষ্যত্বহীন।
পিঁপড়ের মতন তুমি জীবনকে খুঁটে-খুঁটে চেয়েছো বাঁচাতে
রমণী-শরীর ঘিরে চামচিকে হয়ে শুধু জেগে উঠতে রাতে।
এই সব কথা শুনে আমিও তখন উঠে দাঁড়াবো আলস্যে, কিছু ক্লান্ত
তেতো মনে।
নিজেকে চিমনির ধোঁয়া মনে হতে পারে হয়তো বাইরের নির্জনে।
দীর্ঘ কালো ছায়া পড়বে স্বল্পালোকে চকচকানো পিচ-বাঁধা পথে
কার ছায়া? আমারই তো,-বলে আমি মিশে যাবো সশরীরে
অদৃশ্য জগতে।

আমি ও কলকাতা

কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
আমি এর সর্বনাশ করে যাবো-
আমি একে ফুসয়িয়ে নিয়ে যাবো হলদিয়া বন্দরে
নারকোল নাড়ুর সঙ্গে সেঁকো বিষ মিশিয়ে খাওয়াবো-
কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে।

কলকাতা চাঁদের আলো জাল করে, চুম্বনে শিয়ালকাঁটা

অথবা কাঁকর
আজ মেশাতে শিখেছে,
চোখের জলের মতো চায়ে তুমি চিনি দিতে ভুলে যাও এত
উপপতি
তোমার দিনে দুপুরে, ঊরুতে সম্মতি!
দিল্লির সুপ্রিমকোর্টে, সুন্দরী, তোমাকে আমি এমন সহজে
যেতে দিতে পারি? তার বদলে হৃদয়ে সুগন্ধ মেখে সন্ধেবেলা
প্রখর গরজে
তোমার দু'বাহু চেপে ট্যাক্সিতে বাতাস খেতে নিয়ে যাবো-
হোটেলে টুইস্ট নাচবে, হিল্লোলে আঁচল খুলে বুকে রাখবে দু'দুটো
ক্যামেরা
যদু....মধু এবং শ্যামেরা তুড়ি দেবে;
শরীরে অমন বজনা, আয়নার ভিতরে অতি মহার্ঘ আলোর মতো
তুমি, তোমার চরণে
বিশুদ্ধ কবিতাময় স্তাবকতা দক্ষিণ শহর থেকে এনে দিতে পারি
সোনার থালায় স'লপদ্ম চাও দুই হাতে?
তুমি খুন হবে মধ্যরাতে।
কলকাতা আমার হাত ছাড়িয়ে কোতায় যাবে, তুমি
বিছুতে ক্যানিং স্ট্রীটে লুকোতে পারবে না-
চীনে-পাড়া-ভাঙা রাস্তা দিয়ে ছুটলে, আমিকও বাঘের মতো
ছুটে যাবো তোমার পিছনে
ডিঙিয়ে ট্রাফিক বাতি, বড়বাজার, রোগীর পথ্যের মতো
চৌরঙ্গি পেরিয়ে
আমার অনুসরণ, বয়ুভুক নিরালম্ব আত্মার মতন ভঙ্গি
কতর ভালোবাসার, প্রতিশোধে-

কোথায় পালাবে তুমি? গঙ্গা থেকে সব ক'টা জাহাজের মুখগুলো ফিরিয়ে
অন্ধকার ময়দানে প্রচন্ড সার্চলাইট ফেলে
টুঁটি চেপে ধরবো তোমার- তোমার শরীর ভরা পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে বরুদ ছড়িয়ে
আমার গোপন যাত্রা, একদিন শ্রেণীযুগে জ্বালবো দেশলাই-
উড়ে যাবে হর্ম্যসারি, ছেটকাবে ইঁটকাঠ, ধ্বংস হবে
সব লাস্য, অলংকার, চিৎপুরের অমর ভুবন
আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলে যদি, তোমার সহমরণ তবে কি বাঁচবে?

আমি কিরকম ভাবে বেঁচে আছি

আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি তুই এসে দেখে যা নিখিলেশ
এই কী মানুষজন্ম? নাকি শেষ
পরোহিত-কঙ্কালের পাশা খেলা! প্রতি সন্ধ্যেবেলা
আমার বুকের মধ্যে হাওয়া ঘুরে ওঠে, হৃদয়কে অবহেলা
করে রক্ত; আমি মানুষের পায়ের পায়ের কাছে কুকুর হয়ে বসে
থাকি-তার ভেতরের কুকুরটাকে দেখবো বলে। আমি আক্রোশে
হেসে উঠি না, আমি ছারপোকার পাশে ছারপোকা হয়ে হাঁটি,
মশা হয়ে উড়ি একদল মশার সঙ্গে; খাঁটি
অন্ধকারে স্ত্রীলোকের খুব মধ্যে ডুব দিয়ে দেখেছি দেশলাই জ্বেলে-
(ও-গাঁয়ে আমার কোনো ঘরবাড়ি নেই!)

আমি স্বপ্নের মধ্যে বাবুদের বাড়িরে ছেলে
সেজে গেছি রঙ্গালয়ে, পরাগের মতো ফুঁ দিয়ে উড়িয়েছি দৃশ্যলোক
ঘামে ছিল না এমন গন্ধক
যাতে ক্রোধে জ্বলে উঠতে পার। নিখিলেশ, তুই একে
কী বলবি? আমি শোবার ঘরে নিজের দুই হাত পেকেরে

বিঁধে দেখতে চেয়েছিলাম যীশুর কষ্ট খুব বেশি ছিল কিনা;
আমি ফুলের পাশে ফূল হয়ে ফূটে দেখেছি, তাকে ভালোবাসতে পারি না।
আমি ফুলের পাশে ফূল হয়ে ফূটে দেখেছি, তাকে ভালোবাসতে পারি না।
আমি কপাল থেকে ঘামের মতন মুছে নিয়েছি পিতামহের নাম,
আমি শ্মশানে গিয়ে মরে যাবার বদলে, মাইরি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
নিখিলেশ, আমি এই-রকমভাবে বেঁচে আছি, তোর সঙ্গে
জীবনবদল করে কোনো লাভ হলো না আমার -একি নদীর তরঙ্গে
ছেলেবেলার মতো ডুব সাঁতার?- অথবা চশমা বদলের মতো
কয়েক মিনিট আলোড়ন? অথবা গভীর রাত্রে সঙ্গমনিরত
দম্পতির পাশে শুয়ে পুনরায় জন্ম ভিক্ষা? কেননা সময় নেই,
আমার ঘরের
দেয়ালের চুন-ভাঙা দাগটিও বড় প্রিয়। মৃত গাছটির পাশে উত্তরের
হাওয়ায় কিছুটা মায়া লেগে ভুল নাম, ভুল স্বপ্ন থেকে বাইরে এসে
দেখি উইপোকায় খেয়ে গেছে চিঠির বান্ডিল, তবুও অক্লেশে
হলুদকে হলুদ বলে ডাকতে পারি। আমি সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে একবার
একটি মুহূর্ত চেয়েছিলাম, একটি ....., ব্যক্তিগত জিরো আওয়অর;
ইচ্ছে ছিল না জানাবার
এই বিশেষ কথাটা তোকে। তবু ক্রমশই বেশি করে আসে শীত, রাত্রে
এ-রকম জলতেষ্টা আর কখনও পেতো না, রোজ অন্ধকার হাত্ড়ে
টের পাই তিনটে ইঁদুর না মূষিক? তা হলে কি প্রতীক্ষায়
আছে অদুরেই সংস্কৃত শ্লোক? পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর এই অবেলায়
কিছুই মনে পড়ে না। আমার পূজা ও নারী-হত্যার ভিতরে
বেজে ওঠে সাইরেন। নিজের দু'হাত যখন নিজেদের ইচ্ছে মতো কাজ করে
তখন মনে হয় ওরা সত্যিকারের। আজকাল আমার
নিজের চোখ দুটোও মনে হয় একপলক সত্যি চোখ। এরকম সত্য

পৃথিবীতে খুব বেশী নেই আর।।

আর্কেডিয়া

এই বিকেলটা অন্যরকম জীবন আমার ছিড়ে নেবো জমিয়ে
রাখবো বাক্সে
চেনা রাস্তায় ঘুরবো একটা মাঠের মধ্যে বাড়ি আমার
পকেট ভর্তি ঠিকানা
আজকে আমি নত হবো কান্না পেলে লুকোবো না
চাইনে আজ বন্ধুবান্ধব ভাববে ওরা গেছি আমি চাইবাসায়
কিংবা ফরাক্কাবাদ–
ওদের চক্ষু এড়িয়ে আজ পালিয়ে ফিরবো আমি, হাওয়া
তোমায় নাম জানায় কিনা অন্যরকম আর্কেডিয়া
ডবল ডেকার থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে একটা মেয়ের কাছে বলবো
তোমায় আমি ভালোবাসি বিষম ভালো যেমন ভাবে লক্ষ কোটি মানুষ
ভালোবাসে ভালোবাসায়–একটা চুমুর জন্যে মরে ছাদে লুকোয়
বারান্দার কোণে
চোখাচোখির খেলা খেলে-আমিও চাই অমনি না হয় একটা বিকেল
অনাধুনিক হয়েই রইলুম কেইবা দেখছে

পঁচিশ জন্ম আগে আমি ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম
পঁচিশ জন্ম পিছন ফিরে প্রাচীন জন্মে ফিরে এলাম

তুষারমণ্ড ভেড়ার পাল ওরা কেমন খেলে বেড়ায় মেঘলা-করা দুপুরবেলা
পপলারের বনে শব্দ কাণ থেকে প্রতিশব্দ ভ্রমর কিংবা ঝর্ণা
বাঁশী কোথায় ? লুকোস না রে দে ভার্জিল চেনা সুরাটা বাজাই একলা–

চতুর্দিকে বাঁশীর গন্ধ আকাশ থেকে বাঁশীর গন্ধ টিলার উপর দাঁড়িয়ে-
এমন শান্ত সমাধিটা আমার, দেখো আমিও ছিলাম আর্কেডিয়ায়
আমিও ছিলাম
দ্যাখ ভার্জিল আজও আমায় বাঁশী হাতে মানায় কিনা!

এই হাত ছুঁয়েছিল

আহা রে সোনার মূর্তিও কি অবিরল ঝরে যাবে
রাত্তিরে , রোদ্দুরে, বৃষ্টিপাতে পরপুরুষের হাতে
স্তনবৃন্ত দুটি কোন খোলা সুইচ? ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে
এই হাত ছুঁয়েছিল বহু কৃমি, বুকে বাঁধা পাশবালিশ, রক্ত, যেন
রক্তের লালায়
লোভহীন ডুবে মরা, এই হাত ছুঁয়েছিল অশ্রুহীন চোখের চিৎকার
এই হাত ছুঁয়েছিল
এই হাত
সুড়ঙ্গের মতো গলি, খুচরো টাকা নিয়ে ছুটে বিদ্যুতের মতো...
পিছনে জুতোর শব্দ, ঘুমন্ত আয়নার মুখে সিগারেট, এই হাত!

বুকের ভিতরে কোনো বাষ্প নেই কুয়াশায় অন্ধকারে তবু দেখা হল
পুরোনো সিন্দুকে যেন লুকোনো গিনির মতো ঝলসে উঠলো চোখ
স্তনবৃন্ত দুটি কোন খোলা সুইচু, ছুঁয়ে দিলে হাত কেঁপে ওঠে
এই হাতও কেঁপে ওঠে!
ক' কোটি ডাক্তার আছে পৃথিবীতে। পরশুরামের মতো সবগুলোকে মেরে
ওদের রক্তের হ্রদে বেঁচে উঠতে চাই।
গাছের ছায়ার মতো জ্যোৎস্না এই জ্যোৎসার ভিতরে কেউ বেঁচে নেই।

আকাশের নিচে গাছ, আধার পাতার ঝাড়, পাতার ভিতরে স্রোত, সেই
স্রোতের শিরায় নির্মমতা; আপাতত নির্মমতা আঁচল সরিয়ে
বলে, ‘ঐ যে আলো, গোটে দাঁড়ানো মাসতুতো ভাই, আজ তবে যাই?’

যাও, আর কোনোদিন তুমি এক অন্ধকারে গ্রীবা
এনো না আমার কাছে, যাও, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি
বহুক্ষণ থাকবো, আমি কুকুর আটকাবো, যাও, আজ ভয় নেই
আর কোনোদিন নয়। আজ যাও, ভয় নেই, দাঁড়িয়ে রয়েছি।

এক সন্ধেবেলা আমি

এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন
এই হ্রদে ঈশ্বর ছিলেন
ঈশ্বর, তোমার ভূমিকম্প এসে মুছে দিল তোমার মহিমা;
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
এই বৃক্ষ ঈশ্বর আমার
ঈশ্বর, তোমার বজ্র তোমাকেই পোড়ালো বীভৎস
ঈশ্বর, তোমার মতো নিরীশ্বর আর কেউ নেই!...

***

নীরা, তুমি অমন সুন্দর মুখে তিনশো জানাল
খুলে হেসেছিলে, দিগন্তের মতন কপালে বাঁকা টিপ,
চোখে কাজল ছিল কি? না, ছিল না।
বাসস্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ...
কেমন সামান্য হয়ে বসেছিলে, দেড় বছর পর আমি আজও আছি

কত লোভহীন–
পাগলামি! স্বপ্ন থেকে নেমে দূর বাসস্টপে একা হেঁটে যাই।...

***

নদীর পড়ে বসেছিলাম, নদী আমায় কোনো কথাই বলেনি
শুকনো পাহাড় বললে আমায় নদীর কথা–
নারীর কাছে গিয়েছিলাম, নারী আমায় কোনো কথাই বলেনি
ধুলোয় ভরা গ্রন্থ শুধু বললে আমায় নারীর ভাষা।...

***

'এ বছর আর বন্যা হবে না, ঐ দ্যাখো ব্রিজ, ঐ দ্যাখে বাঁধ–'
কে জানে কোথাও কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিল কিনা,
মরা দামোদর পায়ে হেঁটে এসে ছেলেটা মেয়েটা শক্তিগড়ের
দিকে চলে গেল, কে জানে কোথাও কোনো দীর্ঘশ্বাস ছিল। কিনা।...

***

আমার ঠাকুরদাদা মন্দিরের পুজুরী ও ঘণ্টা বাজাতেন
ছোটমাসী নামাবলী কেটে ব্লাউজ বানিয়েছেন লো-কাট;
ছোটমাসী, তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে গিয়ে
প্রথম যৌন আনন্দ পেয়েছিলাম।

একই স্বপ্ন দু'জনে দেখেছি

যেন কাল মরে যাবো ক্ষণকাল সেই কথা ভেবে

গোধূলির দিকে আমি বিদায়ের অস্ত্র তুলে ধরি
গোধূলি কি ফসলের বিবর্তন? নাকি উল্লুকের
প্রশান্ত নাচের ভঙ্গি? দুঃখ ঝরে রক্তের মতন, ঝরে যায়
কিংবা রক্ত দুঃখের মতন? যেন কাল মরে যাবো
ক্ষণকাল সেই কথা ভেবে আমি গোধূলির কাছে
কালো শিল্প দীক্ষা নিতে আসি।

থামে না বাতাস, এত দীর্ঘশ্বাস তোমাকে মানায়?
বলো বলে চুপ করে চেয়ে থাকা কবরের পাশে বসা নয়
সুখ
ভাঁড়ারে জমানো আছে, যেমন ফুলের কাছে কঁচা পয়সা
রোজ ঝনঝনায়
আমি তার চেয়ে ঢের দূরে, আমি প্রত্যেক উত্তর
শেখাই প্রেতের কণ্ঠে, প্রত্যেক অনভিপ্রেত মুখ

গোধূলিকে মান্য করে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দু' একজন
হাসপাতালে মরে,
দু'একজন হাসাহাসি করে যায় বিকেল চারটেয় রেস্তোরাঁয়
অতিশয় চেষ্টা পেলে কোনো কোনো পাখি ডুব দেয়
লবণ সমুদ্রে
এবং ওঠে না।

কি যেন হয়নি শেষ, ঘুমের আবেশে অন্ধকারে
মনে পড়ে, না মনে পড়ে না, কিংবা মনে পড়া মনের গহ্বর
নারীর লজার মতো খুলে যায়, সন্তর্পণে নিজেকে ঠকিয়ে
দশদিকে চেয়ে দেখি, যেন কেউ হঠাৎ না দেখে, যেন চোখ
বিদায়ের হেমন্তের অপ্রেমের অসুখের বিস্মৃতির ললাট এড়িয়ে

মহিষ বাহন হয়ে ফিরে আসে, হাসে জ্যোৎস্না কপিশ মায়ায়-
মনে কেন এত খুশি-যেন একই বালিশে দু'জনে মাথা রেখে
আমি ও আমার মৃত্যু শুয়ে আছিচুপচাপ, শুয়ে আছি, যেন
একই স্বপ্ন দু'জনে দেখেছি।

একটি কবিতা লেখা

প্রতিধ্বনি তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে
কেন ফিরে এলে?

একদিনে লিখিনি। 'প্রতিধ্বনি' শব্দটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও অবাস্তব ভাবে মাথার মধ্যে কয়েকদিন ঘুরঘুর করতে থাকে। শেষ কবিতা লেখার দেড়মাস পর। কী সাধারণ কথা এই প্রতিধ্বনি, তবু তারও একটা দাবি টের পাই। অসহায়ের মতো আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে চাই, তৎক্ষণাৎ কোনো কবিতা লিখতে আমার ইচ্ছে না। কিসের প্রতিধ্বনি তা জানি না। জীবন কাটছে কী রকম-অবিরল দুপুর, বিদেশের চিঠি, পয়সা নেই, সন্ধেবেলা থেকে মধ্যরাত্রি অসম্ভব চোখ বুজে ছোটাছুটি, অপরের কবিতায় ঈষা, পুলিশের প্রতি হাসাহাসি। প্রতিধ্বনিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, অর্থাৎ খুব দূরে পাঠিয়েছিলাম, নিশ্চিত তা হলে স্বর্গে আমার ব্যক্তিগত দূত। প্রথম লাইনটা তৈরি হয়ে যায়। যেন প্রতিধ্বনিকে বলেছিলাম, তুমি স্বর্গে যাও, গিয়ে বলো, আমি আসছি।

বাঙ্গুর কলোনি দিয়ে দুপুরে হাঁটছিলুম। পাশের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল হয়তো, আমি দেখিনি। 'কোনো কবিতা লিখছো, সুনীল?' না, মাত্র একটি লাইন ভেবেছি। অত্যন্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে নীরেনদা বললেন, 'দাঁড়াও, ওই ছেলেটির একটা বল করা দেখি, তারপর তোমার-' মাঠের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। একটা রোগা ছেলে বেজির মতো ছুটে এসে হলুদ বাড়ির দেওয়ালের দিকে বাতাপী লেবু ছুঁড়লো। ইল্বল কোথায়? আমি তারপর আর কিছু দেখতে পেলুম না। 'বলো, তোমার লাইনটা।' বলে আলতো ভাবে জিজ্ঞেস করি, 'দিকে'র

বদলে ‘পানে’ বসালে কেমন হয়? স্বর্গের পানে? ‘আমার মনে হয় তোমার ‘দিকে’ই বসানো উচিত, কেননা’ , ...আরও কিছু কথা হয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে আমি দ্বিতীয় লাইনটা পেয়ে গেছি। ‘কেন ফিরে এলে?’ যেহেতু না ফিরে উপায় নেই। যেহেতু আমার সময় পূর্ণ হয়নি। প্রতিধ্বনি এখনও পুণ্যগর্ভা হয়নি। পূর্ণ না পুণ্য? যাই হোক, ও দুটো একই। অর্থাৎ এবার কবিতাটা না লিখে আমার উপায় নেই।

বাড়ি ফিরতে অনেক বেলা হলো। স্নান করে খেয়ে টেবিলে বসবো ভেবেছিলাম। সিগারেট নেই। ভাতের পর সিগারেট না টেনে কবিতা লেখা? বাইরে সিগারেট কিনতে বেরিয়ে হাতের সামনে একটা বাস পেয়ে কলেজ স্ট্রট চলে যাই। বিকেল থেকে তারপর অন্ধকার। পরদিন সকালে প্রণবেন্দু ও উৎপল এলো। আমরা তিনজনে মিলে ছ’জন মানুষের গলার আওয়াজ শুনলুম। আর একটু থাকবেন? না। তুমি এখন বেরুবে? না। অলিন্দের কবিতাটা লেখা হয়ে গেছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালকেই কপি করে–, তখনও তৃতীয় লাইনটা পাইনি। দুপুরে দীর্ঘ মিছিলের পিছনে পিছনে মন্থর বাস।

আবার সকালে, চা খাওয়া হলো, প্রচুর সিগারেট হাতে, তন্নতন্ন করে কাগজ পড়াও শেষ হয়েছে। এবার-? এবার মুখোমুখি হতেই হবে। হাতের সামনে প্রথম সাদা কাগজে ঝাঁটু করে লাইন দুটো লিখে ফেললুম। লিখে অনেকক্ষণ বসে থাকি। তৃতীয় লাইন নেই। যে কোনো কবিতার তৃতীয় লাইনই বোধ হয় সব চেয়ে শক্ত। এভরি থার্ড থট ইজ মাই কিলার,-না, আমি তখন জ্বরের ঘোরের মতন। ঐ দুটি লাইন আবার লিখি :

প্রতিধ্বনি, তুমি তো স্বর্গের দিকে গিয়েছিলে
কেন ফিরে এলে

এবার প্রতিধ্বনির পর একটা কমা দিয়েছি, শেষে জিজ্ঞাসা দিইনি।

এই আমূল নশ্বর, শূন্যমাঘ, শরীরের কাছে–

একটু চেয়ার ছেড়ে উঠতেই ওই লাইনটা মনে পড়ে। 'আমূল' শব্দটা আমি পাই একটা মাখনের (খালি) টিনের প্রতি চোখ পড়তে। কিন্তু সেই সময় আমি পেচ্ছাপ করতে যাই। সুতরাং, ও শব্দটা বসাতে ইচ্ছে হলো পুরুষের দণ্ড অর্থে। শুধু শরীরই নশ্বর নয়, ও জিনিসটা আরও আগেই নশ্বর যে। শুন্যমাঘ' শব্দটা কেন বসিয়েছি, ফ্র্যাঙ্কলি, জানি না।

পবন-পদবী তুমি, প্রতিধ্বনি, শরীর ও রাত্তিরের চোখ মারামারি
তোমার না দেখা ছিল ভালো

পবন-পদবী শব্দ দুটো কি খুব ভারী হয়ে গেল? হয়তো। লাইনটার গতি ঠিক রাখার জন্য অনায়াসেই হাওয়া বা বাতাস আরূঢ় বসাতে পারতুম। দুটি শব্দেরই শুরুতে 'প', সামান্য একটু ধ্বনি মাধুর্যের লোভে পড়লুম, বুড়ো বয়সে চুরি করে কণ্ডেন্সড় মিল্ক খাবার মতো, গোপন লোভে ও শব্দ দুটোই রাখা হলো। লিখতে লিখতে হঠাৎই অন্যমনস্ক ভাবে বুধবার রাত্রির কথা মনে পড়ে, অন্ধকার ময়দান, প্রমত্ত বান্ধবদল, ঠাণ্ডা লোহার রেলিংয়ে হেলান দেওয়া সেই কস্তাড়ুরে লাল রঙের শাড়ী পরা ধরা-মেয়ে, তার পাগলাটে হাসি, শরীরে অদ্ভুত গন্ধ। আমি রাত্রির থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার কবিতায় আনতে চাই, তখনই উপরের লাইনটার শেষ অংশ মাথায় খেলে। পরের লাইনগুলি স্বাভাবিক ভাবেই আসে :

উত্তর সমুদ্র থেকে উড়ে এসেছিল সাদা হাঁস জ্যোৎ মাময়
তারা নয় বাদামী অসুখ, নয়। বুকের ভিতরে রাখা মুখ
মুখের প্রথম গুরু চোখ তার অসম্ভব জোঙ্গুরিতে অর্ধেক স্তব্ধতা
জিতে এনে, রানীকে জানাতে চেয়েছিল, বহু রানী ও নারীর কাছে
শিখে এসে অপরূপ উরু ব্যবহার,-
মৃত্যু হাঁটু গেড়ে বসে সে সমস্ত নোট করে গেছে।

কারা বারবার ফিরে আসে? যেমন জ্যোৎস্নার হাঁস ও মাথাধরা ইত্যাদি। আমার মাথাধরার রং বাদামী। বুকের মধ্যে সবারই একটা গোপন মুখ রাখা আছে। আমি তার চোখ দেখতে পেলাম। চোখ অতিশয় বাচাল, যদি না সে অর্ধেক স্তব্ধতা জয় করে নিতে পারতো। এই

সবই তো বলাই বাহুল্য। বস্তুত, আমি নারী লিখতে গিয়ে ভুল করে রানী লিখে ফেলি। তারপর রানীকে কাটতে গিয়ে রাজ-রোষের ভয় হয়। রানী শব্দটা দেখতেও বেশ। রেখে দিই, মনে হয়, সব নারীই তো আসলে রানী। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, না, ঠিক নয়, সব নারী নয়। সুতরাং পরে দুটোকে আবার আলাদা করে সরিয়ে দিতে হয়। মৃত্যুর কথাটা অকারণ খেয়াল। লিখে ফেলেই খুব হাসি পায়। একলা বসে খুক খুক করে হাসি। মৃত্যু আজকাল হয়েছে অবিকল খবরের কাগজের রিপোর্টরের মতো। খাঁটি স্ক্যাণ্ডাল মঙ্গার একটি। যে-কোনো গুজব শুনেই এসে হাজির হয় যখন তখন, সর্দি-কাশি-মাথাধরা টিটেনাস-কিছু একটা হলেই খাটের পাশে এসে দাঁড়াবে। কি রকম হাঁটুগেড়ে বসে শর্টহ্যান্ডে নোট নিচ্ছে!

স্পেস! অর্থাৎ আবার বাড়ি থেকে বেরুতে হলো। পরের লাইনগুলি তখন ছায়ামূর্তির মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। মাঝরাত্রে জাগ্রত মানুষের ঘরের জানলার ঝিল্লিতে যেমন স্বপ্নেরা অপেক্ষা করে (এই উপমাটা আমার বারবার মাথায় আসে)। ডালহৌসিতে তারাপদ হাত ধরে টেনে রেখেছে, ও ওর ভবিষ্যৎ জীবনের কিছু কথা জানাতে চায়, কিন্তু আমি তখন আমার গোপন। গত জীবন নিয়ে বিষম বিব্রত, হাত ছাড়িয়ে চলতি ট্রামে লাফিয়ে উঠলুম। সকালে প্রণব সেই দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি, যখন হাসপাতালে ডাক্তার আমার ডান হাত থেকে এক সিরিজ রক্ত টেনে নিচ্ছিল। এক ঘণ্টা পর বাড়িতে, প্রথমেই মনে পড়ে, 'তোমাকে বিদায় দিয়ে' ;

তোমাকে বিদায় দিয়ে আমি পরশয্যায় ঘর্মাক্ত
স্তনের দুধের আঠা, মাসের তিনদিন রক্ত, প্রতিশোধ, ঘুম অন্ধকারে
বিস্মৃতির পদশব্দ, বৃষ্টির মতন দ্রুত পাঁইট, বহু বুকখোলা
হা-হা শব্দে, ভিজে
অতি ঐশ্বরিক কোনো প্রাণীর মতন লিপ্ত হয়েছিলাম, অয়ি প্রতিধ্বনি,
তুমি তো স্বর্গের দিকে—আত্মার সরল শব্দ, মেঘ, মায়া পাহাড়
পেরিয়ে

ঘাই হরিণীর ডাক যেমন সমুদ্র পাড়ে ফেরে...

'ঘাই হরিণীর',–শব্দটা জীবনানন্দের থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, কিন্তু আর উপায় নেই, সময় নেই, অসম্ভব খিদে পেয়েছে। এ কবিতার হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই। আজ বিকেলে কথা রাখতে হবে। কিন্তু উঠতে পারছিনা, মন বলছে, আর একটা লাইন বাকি আছে, শেষ লাইন। পরপর বিদ্যুতের মতো আঠারোটা লাইন মাথায় এলো, রেলগাড়ির কামরার মতো, একই রকম দেখতে অথচ এক নয়। খিদে-পেটে কী সমস্ত চমৎকার লাইন যে মাথায় আসে, অথচ খেয়ে উঠে তার একটাও মনে থাকে না। কিন্তু ওগুলো এ কবিতার লাইন নয়। একটা পুরোনো লাইনই বারবার দাবি জানাচ্ছে। হ্যাঁ নিশ্চিত, তুমিই এসো :

'কেন ফিরে এলে?' কেন ফিরে এলে?

একবার হাসপাতালে যাও

একবার হাসপাতালে যাও সুস্থ একটি আপেলের মতো
শায়িতা মূর্তিরা সব তোমাকে ঠোকরাবে চোখে চোখে
ছিমছাম নার্সেরা ঘুরবে, অবিশ্বস্ত নম্রতায় নত
দৈনিক চাকরির মতো আত্মীয়েরা মুহ্যমান ধরাবাঁধা শোকে।

কেউ বা যকৃৎরোগী, ফুসফুসে পোকা পুষিছে কেউ
মাতাল গোরার হাতে হাড়ভাঙা কোণে একজন
ডেটলের কটুগন্ধ নিয়ে আসে সাময়িক বাতাসের ঢেউ–
এরা সব বেঁচে আছে, সাক্ষী আছে বুকের স্পন্দন।

তুমি এসে লঘুপায়ে বোসো এক রোগিনীর পাশে
সুস্থ করতল দিয়ে একবার ছুঁয়ে দাও বিবর্ণ শরীর
দুধের অর্ধেক তাকে খেতে দিয়ে সরটুকু ফেলে দাও

অলীক বিশ্বাসে
দুই চক্ষু দিয়ে বলো : চিরদিন এই পৃথিবীর

একজন রোগোর্ত থাকবে অন্যজন চিরদিন সুখের প্রতীক।
একজন বিকেলবেলা বহুদূর পথ ভেঙে হাসপাতালে এসে
মাটির মানুষ হয়ে বসে থাকবে, অন্যজন দুই হাতে জানালার শিক
ধরে থাকবে প্রতীক্ষায়, প্রতীক্ষার স্বাদ ভালোবেসে।

এবার কবিতা লিখে

এবার কবিতা লিখে আমি একটা রাজপ্রাসাদ বানাবো
এবার কবিতা লিখে আমি চাই পনটিয়াক গাড়ি
এবার কবিতা লিখে আমি ঠিক রাষ্ট্রপতি না হলেও
ত্রিপাদ ভূমির জন্য রাখবো পা উঁচিয়ে-
মেশপালকের গানে এ পৃথিবী বহুদিন ঋণী!
কবিতা লিখেছি আমি চাই স্কচ, শাদা ঘোড়া, নির্ভেজাল ঘৃতে পক্ক
মুরগী দু-ঠ্যাং শুধু, বাকি মাংস নয়-
কবিতা লিখেছি তাই আমার সহস্র ক্রীতদাসী চাই-
অথবা একটি নারী অগোপন, যাকে আমি প্রকাশ্যে রাস্তায় জানু ধরে
দয়া চাইতে পারি।
লেভেল ক্রসিংয়ে আমি দাঁড়ালেই শুনতে চাই তোপধ্বনি
এবার কবিতা লিখে আমি আর দাবি ছাড়বো না
নেগি কুত্তা হয়ে আমি পায়ের ধুলোর থেকে গড়াগড়ি দিয়ে আসি
হাড় থেকে রক্ত নিংড়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছি, ভিক্ষা চেয়ে মানুষের
চোখ থেকে মনুষ্যত্ব খুলে-
কপালের জ্বর, থুতু, শ্লেষ্মা থেকে কবিতার জন্য উঠে এসে

মাতাল চন্ডাল হয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফের ছাই থেকে উঠে এসে
আমার একলা ঘরে অসহায়তা মতো হা-হা স্বর থেকে উঠে এসে
কবিতা লেখার সব প্রতিশোধ নিতে দাঁড়িয়েছি।।

কাটামুণ্ডের দিবাস্বপ্ন

আঠাশ বছর কাটলো, মৃত্যুর এখনো দেরী একশো আঠাশ
নদীর ওপারে, শুকনো হাড়ের পাহাড়ে
সব বন্ধুদের ভাঙা কবরখানায় ফুলমালা দীর্ঘশ্বাস
দিয়ে যাবো, পৃথিবীর শেষ শোকসভায়
দেখাবো বিষম ভেল্কি একা বুনো হাড়ে।
হাওয়ায় উড়িয়ে যাবো পাণ্ডুলিপি, শতাব্দীর পাঁশুটে হাওয়ায়
সিগারেট টানতে হলে বইগুলো ছিঁড়ে
চমৎকার জ্বেলে নেবো, একটু বেশী ধোঁয়া হবে, তা হোক, শরীরে
ছারপোকার খুনোখুনি বন্ধ হবে তবুও অন্তত।
পৃথিবীর গাছগুলি সে-সময় পাতাহীন, ফুলহীন, কিন্তু আপাতত
জেনে নেওয়া যাক তবু, কে তুমি বকুল, শাল কিংবা দেবদারু
মনে রেখে তোমরা, ওহে স্থির
একদিন চরাচর অবশ্যই বিষম বধির
হয়ে যাবে, তখন কে আর কাব্য না খেয়ে না দেয়ে লিখবে
আমাদের মতো
অথবা বিরলে বসে পড়বে-শুনবে, দুঃখ পেতে যাবে।

এবং অস্থির গাছ লাল নীল হলুদ গোলাপী
কুমারী বা সদ্যোজায়া তোমাদের প্রতি ওষ্ঠ্যপুটে

জানাতে পারিনি প্রেম, কিংবা আহা, তোমাদের শরীরের প্রতি
অঙ্গ খুঁটে
এমন রূপের স্তোত্র আমরা ক'জন এই পুরাতন পাপী
ছাড়া আর কেবা লিখবে? কেবা দেবে অমরত্ব, আর কেউ দেবে না!
সতত সঞ্চারমানা আজো যারা, কোনোদিন দেখা হয়নি
গৌরী, কৃষ্ণা অথবা শ্যামলী
প্রলয়ের আগে শেষ কথা আমি বলি
ও মসৃণ শোভাগুলি মৃত্যু কিংবা বিবাহের আগে এসে
কবিতার ভিতরে লুকাও
ঠিকানা বা ফোটোগ্রাফ, অথবা অকুণ্ঠে চলে এসো সশরীরে
পৃথিবীর শেষতম কবির দু'চোখ ছুঁয়ে যাও!

ক্লান্তির পর

আমি তোমার অধর থেকে ওষ্ঠ তুলে তাকিয়ে দেখি মুখের দিকে
তুমি তোমার কোনো কথাই রাখেনি
কথা ছিল কি এমন করে কান্না, এমন
চোখের দুই পাশ মুচড়ে তাকানোর?
কথা ছিল কি বিকেলবেলা ঘড়ির নিচে মায়ার খেলা
আদর পেয়ে মার্জারীর মতো শরীর বাঁকানো?
হাওয়ায় এখন নদীর মতো শব্দ ওঠে
তিনটি কথা বলতে এসে তোমার ঠোঁটে
চোখের মধ্যে দেখতে পেলাম মনোহরণ;
এখন আমার দুঃখ হয় না, রাগ হয় না, ঈর্ষা হয় না
এখন তোমার শরীর থেকে ফুলের গয়না

হাওয়ায় দাও ছড়িয়ে, কেউ এসে তোমায় রক্ষা করুক-
তুমি ভেঙেছো দুঃখ দিনে কঠিন পণ
নদীর শব্দ ছাড়িয়ে এখন বেজে উঠলো মেঘের মতো দুই ডমরু।

সখী, এবার স্পষ্ঠ কথা বলার দিন এসেছে
দু'পাঁচ বছর বাঁচাবো কিনা কেউ জানি না-
আমার কথা শীতের দেশের পাখির মতো ঝরে পড়ে
চিঠি পেয়িছি হিয়েরোগ্লিফিক্স্ অক্ষরের স্বরান্তরে
বরফ ফেটে অকস্মাৎ বেরিয়ে আসে জলস্তম্ভ
আমি যখন তোমার বুকে মুখ ডুবিয়ে গন্ধ শুঁকি
বৃক্ষ তখন আত্মা পায়, বায়ুতে এসে নিরালম্ব.....
ফূলের মধ্যে সূর্যমুখী
ফুটবে আজ দেরিতে খুব, সবুজ ঘরে জ্বলে এখন কমলা আলো
রক্ত আমার অবিশ্বাসী, সন্ধেবেলা দুটো নেশাই লাগলো ভালো
ক্লান্ত মাথা সরিয়ে এনে চোখ রেখিছি তোমার গালে
শরীর খুলে অন্য শরীর, কেন এমন লোভ দেখাল?
কিছুই বলা হলো না, তুমি কথা রাখোনি, দুঃখে অভিমানে
শ্বাসকষ্ট হলো আমার, চোখেও জল এসেছিল।
চোখে সে কথা জানে
আমি
দ্বিধার মধ্যে ডুবে গেলাম!

কয়েক মুহূর্তে

কোনোদ্বিধানেই আমি অসম্ভব ভালোবাসা এইমাত্রতোমারচিবুকে

রেখে এলুম ১১টা ১০ এ চোখযুমেযদিঅতনা জড়াতো
পৃথিবীর সবদরজাখুলে আমি অসম্ভব শব্দশুনে অসম্ভব ধবলমিনার
প্রতিনিধিরেখে তুচ্ছ একযৌবনেরপুণ্যফলে
তোমারদ্বিধারমধ্যেচলেযেতম ভয় নেই ১০৮ চুম্বনের দাগ
থাকবেনাসকালে ওইবুকের ভিতরেমণিচুরিযায়নি
বুকশুধুমুখের গরমে

খিদে

কী বিষম দুঃখ এসেছিল আজ ভোরবেলায়, কাঠবাদাম, চকলেট, স্ট্রবেরি
অথবা এগফিলিপ!–তার বদলে পোড়া সিগারেট
বিনা অনুপানে খেয়ে শেষ করলুম, হেমন্ত শিশির
ভুরুতে ও ওষ্ঠে মাখা কত ভালো, কত ভালো তার চেয়েও
প্রাইভেট কবিত্ব!

ফুলের বিছানা পেতে রেখেছিলে, আমি যাবো দু'তিনদিন পরে
হায় রে বাতাস থেকে কোন হাঁস ছেচে নেবে ফুলের দুর্গন্ধ? আমি কাল
মাটিতে লুকোনো বৃষ্টি শুকে শুকে ছ'জন লোকের
দরজায় গিয়েছিলাম, কেউ জানে না কোন ঘরে ফুলের বিছানা,
কোন দরজার ফুটো চমৎকার খাপ খাবে আমার বসন্তে।

আঁতুড়ে ঘরের পাশে মধু নেই-ত্রিভঙ্গ বুড়ির হাহাকার
আটাশ বছর পার হয়ে এলো, বেলা হলে আটাশ বয়েসী
এই ছ'জন ষণ্ডামার্কা-চোখ বেঁকানো দুপুরের রোদে-
বড় হুলস্থূল করে,-ভোর থেকে না খেয়ে আছি, কিংবা বলা যায়
আজীবন!

তবু বারান্দার থেকে হাতছান!—এলোচুলে ভ্রমরাক্ষি,-ওহে
সাত লাইন কবিত্ব চাও? নাকি খাওয়াদাওয়া নিয়ে নোনতা আলোচনা
চলতে পারে? ঠোঁট খেতে কেমন লাগে কিংবা বুক, তবে সাফ
কথা আমি কিন্তু নিজের শরীর থেকে কিছুই ঝরাতে চাই না এই দুঃসময়ে।

ছ'জন লোকের মুখ দেখে দেখে পচে গেল চোখ, গেল ফুল
নাক পরিষ্কার করে এক-একবার দুনিয়া কাঁপানো
শ্বাস নিতে ইচ্ছে হয়, ডাক্তারের বরাভয় পেলে সন্দীপন
গরম দুধের সঙ্গে গল্প লিখবে, আমি কার কাছে যাবো, গিয়ে বলবো,
মশায়, চোখের
চামড়াখানা বাদ দিয়ে, বুকের পাঁজর ছেচে, রক্ত ধুয়ে, দাঁতগুলো তুলে
আমাকে নতুন একটা লোকের মতন করে দিন না, বেঁচে যাই এ-যাত্রায়।

ঘুম

শীতের মদিরেক্ষণ আমাদের ওষ্ঠে লেগে আছে,
করতলে ঘুম নামে, ঘুমে উষ্ণ হয়ে আসে ললাট তোমার,
এবার ঘুমোবো। আমরা দুইজনে, বসন্তের দেরী নেই আর।

যদি পাতা ঝরে যায়, যদি ফুল এ বসন্তে একবারও না ফোটে
টেবিলে আলপিন-গাঁথা ছারপোকার মুহুর্মুহু বাঁচার প্রয়াস
যদি থেমে যেতে দেখি, সূর্য তার অন্তিম আগুনে
কিছু ভয় সেঁকে নিতে যদি নীল ফুসফুসের রন্ধ্রেরও ভিতরে লুকোয়
তবু এই মধ্যরাত্রে কিছুক্ষণ আমরা ঘুমোবো দুইজনে,
শীতের মন্দিরেক্ষণ আমাদের ওষ্ঠে লেগে আছে।

চোখ বাঁধা

অরুন্ধতি, সর্বস্ব আমার
হাঁ করো, আ-আলজিভ চুমু খাও, শব্দ হোক ব্রহ্মাণ্ড পাতালে
অরুন্ধতি, আলো হও, আলো করে, আলো, আলো,
অরুন্ধতি, আলো–
চোখের টর্চলাইট নয়, বুকে আলো, অরুন্ধতি, লাইট হাউস হয়ে
দাঁড়াবে না?

বুকের উপরে দুই পা, ফ্লুরোসেন্ট উরুদ্বয়,
মন্দিরের দেয়ালে মাছের
রূপ মনে পড়ে,–কেন এত রূপ? রূপ বুঝি জন্মান্ধের খাদ্য,
বুঝি মহিষের টুকরো লাল কাপড়–
জলে ডুবে সূর্য স্তব, চোখ বেঁধে প্রণয়ের মতো
অরুন্ধতি, জীবন সর্বস্ব, নাও চোখ নাও, বুক নাও,
ওষ্ঠ নাও, যা তোমার ইচ্ছে তুলে নাও
তুলে নাও, নষ্ট করো, ভাঙো বা ছড়াও, ফেলে দাও, অরুন্ধতি!

যদি ভালোবাসা দাও, অরুন্ধতি, কবিতার পিঠে চুরি মেরে
সহমরণের ব্রতে চলে যাবোম সেই ভালো, একটা চোখ
ছুঁড়ে দিও জলে–
বড় সাধ ছিল আমি স্বর্গে যাবো, মুখ লুকাবো এমন বুকের
ছায়া আছে আর কোথায়, নেই পৃথিবীর উপবনে, নেই রেখাচিত্রে
মাংসের হরষে
না-লুকানো মুখগুলি বড় ব্যস্ত, বড় উপশিরাময়, যেন ঘোরে

প্রতিশোধে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায়,
মহাশূন্যে, সর্বনাশে
আমিও অপ্রেম থেকে ফিরে এসে, অরুন্ধতি, তোমার চোখের
অশ্রুপান করি।
আমিও পৃথিবী, স্বর্গ, কলেজ স্ট্রীটের মহা অগ্নিকাণ্ড দেখে
শিল্পকে প্রহার করি, ভেঙেচুরে নষ্ট করি, লাথি মেরে নরকে পাঠাই
তোমার শরীর শিল্প, আমার শরীর শিল্প, অরুন্ধতি তোমার আমার।

চোখ বিষয়ে

আমি তোমাদের কোন্ অনন্ত ছায়ায়
শুয়ে আছি, শুয়ে রবো, আমি তোমাদের
থেকে বহু দুরে তবু ছায়ার ভিতরে
শুয়ে আছি, জেগে আছি, শিয়রে ও পায়ে
ছায়া পড়ে, ছায়া কাঁপে, চোখের ছায়ায়
মাছ খেলা করে, ভাসে, আমি তোমাদের
মাছের মতন চোখ ছায়ার সাঁতারে
তুলে আনি, তোমাদের গোলাপজামের
মতো চোষ ভালোবাসি, মুখে দিই, দাঁতে
‘তোমাদের’ ভালোবাসাময় চোখগুলি
ভেঙে যায়, মিশে যায়, হেমন্ত বেলায়
শিরীষ ফুলের মতো তোমাদের চোখ
আমাকে পালন করে গোধুলি ছায়ায়।

‘তোমাদের’ শব্দটিতে অনেক কুয়াশা
যেমন শব্দের কাছে নীরবতা ঋণী

যেমন নীরব ফুল সব বন্দনার
চেয়ে শ্রেষ্ঠ, ভ্রষ্ট ফুল যেমন বুকের
কাছে হাত জোড় করে, ছায়ায় শয়ান
ফুল ও বুকের চেয়ে কোমল পাছার
সঙ্গীতের মতো ভঙ্গি যেমন অনেক
দূর মনে হয়, আমি মনের কুয়াশা
'তোমাদের' মুখে রাখি, তোমাদের চোখ
কাজলের মতো লাগে, চোখে চোখে ছুঁয়ে
আমি দেখি, শুয়ে থাকি, যেন বিপুলের
ভিতরে নিঃস্বতা কাঁপে, চঞ্চলতা যেন
ছায়ায় গোপন, মুখ মুখশ্রী লুকোয়-
মুখের ভিতরে চোষ ভাঙে মিশে যায়।।

জুয়া

অত্যান্ত ঠান্ডা মাথায় জীবন বদলে নিলাম আমি ও নিখিলেশ,
হাতঘড়ি ও কলম, পকেট বই, রুমাল-
রেডিওতে পাঁচটা বাজলো, আচ্ছা কাল
দেখা হবে,- বিদায় নিলাম,- সন্ধেবেলার রক্তবর্ণ বাতাস ও শেষ
শীতের মধ্যে, একা সিঁড়ি দিয়ে নামবার
সময় মনে পড়লো- ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার
এসবও বদলানো দরকার, যেমন মুখভঙ্গী ও দুঃখ, হাসির মুহূর্ত
নিখিলেশ ক্রুদ্ধ ও উদাসীন, এবং কিছুটা ধূর্ত।

হাল্‌কা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমি নিখিলেশ হয়ে বহুদূর
হেঁটে গেলাম, নতুন গোধূলি ও রাত্রি, বাড়ি ও দরজা এমনটি অন্তঃপুর

ঘুঁমোবার আগে চুরুট, ঘুমের গভীরতা ও জাগরণ-
ছ'লক্ষ অ্যালার্ম ঘড়ি কলকাতার হিম আস্তরণ
ভাঙার আগেই আমি, অর্থাৎ নিখিলেশ, টেলিফোনে নিখিলেশ
অর্থাৎ সুনীলকে
ডেকে বলি, তুই কি রোড কন্ডেন্স্ড্ মিল্কে
চা খেতিস? বদ গন্ধ, তা হোক! আমি অর্থাৎ পুরোনো সুনীল,
নিখিলেশ এখন,
তোর অর্থাৎ পুরোনো নিখিল অর্থাৎ নতুন সুনীলের সিংহাসন
এবং হৃঃপিন্ড ও শোণিত
পেতে চাই, তোর পুরোনো ভবিষ্যৎ কিংবা আমার নতুন অতীত
তোর নতুন অতীতের মধ্যে, আমার পুরোনো ভবিষ্যতে
(কিংবা তোর ভবিষ্যতে আমার অতীত কোনো পঞ্চম অতীত ভবিষ্যতে)
কিংবা তোর নিঃসঙ্গতা, আমার না-বেঁচে-থাকা হৈ-হৈ জগতে
দু'রকম স্মৃতি ও বিস্মরণ, যেন স্বপ্ন কিংবা স্পপ্ন বদলের
বীয়ার ও রামের নেশা, বন্ধুহীন, বন্ধু ও দলের
আড়ালে প্রেম ও প্রেমহীনতা, দুঃখ ও দুঃখের মতো অবিশ্বাস
জীবনের তীব্র চুপ, যে-রকম মৃতের নিঃশ্বাস,-
লোভ ও শান্তির মুখোমুখি এসে আমার পূজা ও নারীহত্যা
তোর দিকে, রক্ত ও সৃষ্টির মধ্যে আমি অগত্যা
প্রেমিকার দিকে যাবো, স্তনের ওপরে মুখ, মুখ নয়, ধ্যান ও অসি'রতা
এক জীবনে, ঊরুর সামনে ঊরু, ঊরু নয়, যোনির সামনে লিঙ্গ, অশরীরী,
ঘৃণা ও মমতা
অসম্ভব তান্ডব কিংবা চেয়ে দেখা মুহূর্তের রৌদ্রে কোনো কুরূপা অস্পরী
শীত করলে অন্ধকারে শোবে। দুপুরে হঠাৎ রাস্তায় আমি তোকে
সুনীল সুনীল বলে ডেকে উঠবো, পুরোনো আমার নামে, দেখতে চাই চোখে

একশো আট পল্লব কাঁপে কি না, কতটা বাতাস লাগে গালে ও হৃদয়ে
ক'হাজার আলপিন, কত রূপান্তর জন্মে, শোকে পরাজয়ে,
সুখ, সুখ নয় পাপ, পাপ নয়, দোলে, দোলে না, ভাঙে, ভাঙে না, মৃত্যু, স্রোতে
আমি, ও আমার মতো, আমার মতো ও আমি, আমি নয়,
এক জীবন দৌড়াতে দৌড়াতে।।

জ্বলন্ত জিরাফ

শেষ কবে নারীহত্যা করেছি আমার ব্যক্তিগত স্বর্গে? বাথরুমে- ছ'মাস আগে, সেই থেকে চোখে ভালো দেখতে পাই না। সাতদিন পর্যন্ত আয়নায় হাসির প্রমাণ লেগেছিল- এছাড়া চোষের জল জমিয়ে রেখেছিলাম বেসিনে। সেই ঠান্ডা চোখের জলে রোজ মুখ ধুতাম ও কুলকুচোঁ করেছি জানালা দিয়ে। প্রতিবেশী এসে বিরাট আপত্তি জানালোঃ এতদিন পেচ্ছাপ করা সহ্য করেছি, তা বলে কি কুলকুচো করাও। তার ছোটো বাড়ির রঙ শাদা ছিল।

পুলিস এসে বলেছিলো, এই নিয়ে সাতটা খুনের জন্য তুমি মোট তেরোটা ছুরি ভেঙেছো। ইস্পাতের এ-রকম অনটনের দিনে তোমার অমন বিলাসিতা। এরপর থেকে তোমার ঐ খামখেয়ালরি জন্য যত খুশী সিল্কের রুমাল বা ধুত্রোফল ব্যবহার করবে। কিন' ইস্পাতের অপচয়ের মতো বে-আইনী। দু'বছর অন্তত ঘানি ঘোরাতে।- আমার ঘড়ি ছিল না বলে ক'টা বাজে দেখবার জন্য আমি মণিবন্ধটা কানের কাছে। রক্ত চলাচলের স্পষ্ট শব্দ ও সময়।

টেলিফোন মিস্ত্রী অভিযোগ জানালো, আমার ঘরে রেডিও নেই কেন। সরমা অনুযোগ করেছিল, আমার ঘরে কোনও ছবি নেই। আমি ওকে টেবিলের সম্পূর্ণ খালি সতেরোটা ড্রয়ার দেখিয়েছিলাম। ও দূরের জ্বলন্ত জিরাফ একেবারে লক্ষ্য করেনি। সেই পাপেই ওর মৃত্যু হলো। দাঁতের ডাক্তার আমার পায়ে ঘা কর দিয়েছিলো বলে আমি কখনও আর সে

শুয়োরের বাচ্চা জীবানু সমন্বয়ের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাইনি। তার বদলে আমি এখন পেচ্ছাপ ও কান্নার সম্পর্ক নিয়ে বই লিখছি। এখন রাত্রি কি দিন চেনা যায় না।

তিন ঘণ্টা বিচ্ছেদ

ভালোবাসা ছিল কাল সন্ধেবেলা, এখন দুপুরে একটু বিরক্ত লাগছে
তা হলে মাঝরাত অবধি আমাদের ভালোবাসা থাক না মুলতবি!
কিছুক্ষণ দু'জনেই দূরে থাকি,
তুমি যাও ফিলমে কিংবা রেস্তোরাঁয় বা সখী-সম্মেলনে,-
অথবা বাথরুমে গিয়ে গান গাও;
তিন ঘণ্টা কাটাবো। আমি অন্য জায়গায়,
তুমি যাও,
না, চোখে থাকবে না নেশা অথবা ক্লান্ত হবো না
খুব ভালোবাসবো রাত্রে শুয়ে।

এ বাড়ি নিলাম হবে যেন কাল,
এই খাট, আলনা ঠোঁট, বুক আলমারি
যেন কাল থাকবে না-এই ভেবে এ কি মারাত্মক আঁকড়ে থাকা।
শরীরের নোনতা ঘাম, চুম্বনের ঐটো থুতু সারাক্ষণ স্বাস্থ্যকর নয়।
সন্ধ্যার আকাশ থাক,
দেখবো না পথে পথে নতমুখে মানুষের শোভা
একবার তবুও বাইরে;-নির্বোধ হুল্লোড় এত চতুর্দিকে
এর মধ্যে কিছু কি আনন্দ
খুঁটে তোলা যায় না? কিংবা দেখা যাক না একলা থাকতে কী রকম লাগে-
কোথাও মানুষ আজ একা নেই,

যেন সাইরেনের শব্দে সকলেই হুড়োহুড়ি করে
এক ঘরে কাটাচ্ছে দিন, বুকের মধ্যেও একটু জায়গা নেই।

অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে পুনশ্চ সিঁড়ির
উপরে তাকিয়ে দেখি, কোন এক অশরীরী পঙ্গু নিশাচর
হাহাকারে কান ধরে টেনে রাখে;
সন্ধেবেলা কোথাকার তালাবন্ধ সদর দরজার
সামনে দাঁড়িয়ে আমি? তা হলে কি ফিরে যাবো
খাটের নিচের নিরালায়
শার্ট প্যান্ট এবং শরীরখানা খুলে রেখে বলে উঠবো আমি :
বহুদিন কথা হয়নি, ঝিনুকের মধ্যে তুমি কী রকম রয়েছে ভ্রমর?

তুমি শব্দ ভেঙেছিলে

তুমি শব্দ ভেঙেছিলে, তোমার নিষ্কৃতি নেই, তোমার গরিমা
একা গোধূলির যুপকাষ্ঠে চলে যাবে, আগুন ও পৃথিবীর দেহ, শব
আগুন ও পৃথিবীর দেহের ভিতরে শব্দ, তুমি নীল শব্দগুলি
হলুদ করেছো
তোমার নিষ্কৃতি নেই, তুমি ভেঙেছিলে ভীল রমণীর প্রগাঢ় তামস-
জ্যোৎস্নায় মাদুর পেতে যারা পিকনিক করে, যারা হাসে,
ধুলো ছেড়ে, ধুলো হয়
বিমানপতন কিংবা নেহরুর মুখের ওপর বিস্কুটের গুড়ো, ঝোল,
বোতলের চাবি
সবাই নিঃশব্দ; দশদিকে নজন বন্ধু ছুটে যায়, সিল্কের আঁচলে
দেশলাই, তবু কারো

দৃষ্টির উত্থান আগুন ও পৃথিবীর দেহে নয়, শব্দে নয়–মহুয়া ফুলের
ছায়ায় প্রস্রাব করে একজন, একজন প্রণাম করে–তরুণ বৃক্ষটি
দুজনেরই দিকে হোসেছেন–

তখন কোথায় ছিলে তুমি, কোন পাপ ও দুঃখের মতো অদ্ভুত শীতল
সমতটে? তুমি শব্দ, তুমি হেম, তুমি প্রেত, তুমি মুখশ্রীর
সর্বনাশ কারখানায় লিপ্ত থেকে শুক্র গন্ধ, বুক-ছেড়া হাসি ও সূক্ষ্মতা–
তোমার নিষ্কৃতি নেই, মৃত্যুর দ্বিতীয় জন্ম, মৃত্যুর অনেক আয়ু
যেমন গভীর
শৃঙ্খলের পদশব্দ, পরিণতি, কাতর নিশ্বাস অরণ্যের মেঘ থেকে
আসে, যায়, ঘোরে–
শোনে প্রত্যেক কীর্তির ভাঙা গলা, বাতাস অতীব লঘু যেমন শ্মশানে–
শ্মশানও নিবন্ত আজ, চতুর্দিকে পড়ে আছে চণ্ডালের হাড়।

দাঁতের ব্যথায় ভুগছেন একজন দার্শনিক

যেন তিনটে শীত ঋতু জমলো তাঁর দাঁতের গোড়ায়
আহা উহু ছাড়া অন্য কথাগুলি অর্ধেক সোচ্চার
পঞ্চাশোর্ধ্ব দার্শনিক লম্বমান করুণ শয্যায়
শিয়রের জানলা খোলা, গৃহভৃত্যগুলি সব বেক্লিক নচ্ছার।
সারাদিন লোক আসছে, সম্পাদক, অধ্যাপক, আমি, কিছু
উচ্চিংড়ের মতো ছাত্র, বাল্যবন্ধু প্রবীণ কেরানী
‘অনিত্য দেহের মোহ’, ‘মায়াচক্র’ ইত্যাকার

স্বলিখিত পুস্তকের বাণী
চারিদিকে মুখভঙ্গী করে; আর সুখ, আহা সুখ,
এতদিনে জানা গেল, কোন মন্ত্রে ভর করে নির্বোধের বুক!
ভুমার উপমা ছেড়ে ঘুরে ফিরে দাঁতের গোড়ায় যাচ্ছে মন
পৃথিবীর সারবস্তু উষ্ণ জল, বোরিক- কটন!

দু'জনের কাছে ঋণ

একজনের কাছে কিছু ক্ষমা ভিক্ষা আছে, আরেকজনের কাছে প্রতিশোধ
তোমরা দুজন আজ কোথায় রয়েছো?
দুই ঋণ
আমি দু'জনের কাছে ঋণী
আমি ক্ষমা চাইবো, আমি ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবো।
নতজানু হয়ে বসবো বহু অশ্রুজলে, মাটির মায়ায় দুই হাত
কপালের থেকে কিছু রক্তবিন্দু, ক্ষমা করো, একজীবন যাপন করেছি
আমি বারান্দার কাছে-ক্ষমা করো, আমি মধ্যরাত ভেঙে একা
ওষুধের কারখানা লুণ্ঠন করেছি, ক্ষমা করো!
আমি ভিখারির হাত থেকে নিজে ভিখারি হয়েছি
অন্ধ মানুষের পাশে হেঁটেছি চোখ বুজে
স্ত্রীলোকের ইশারায় বহু ভুল অরণ্যে গিয়েছি
আজ নতজানু, ক্ষমা করো, ক্ষমা, কেউ একজন।
আমি প্রতিশোধ নেবো, আমার রক্তের মধ্যে হা-হা শব্দে
আগুন জ্বলেছে
শিরাগুলি টানটান, চোখ জেগে, কেউ একজন, আমি প্রতিশোধ নেবো-
আমার কব্জির পাশে রেখেছিলো নোংরা হাত

আমার বুকের খুব কাছাকাছি ভিয়েৎনাম জাগিয়ে তুলেছে
আমার চোখের দিকে এমন তাচ্ছিল্য চোখে চেয়েছিল
আমার স্বপ্নের মধ্যে বিদায়ের ঘণ্টা বাজিয়েছে
আমি প্রতিশোধ নেবো, ক্ষমা চেয়ে প্রতিহিংসা নিতেও ভুলবো না।

দুপুরে রোদ্দুরে

জ্যোৎস্নার মতো শীতের রোদ, বাসের হাতল ধরে আমি দাঁড়িয়ে
রইলাম, ঋজু, পকেটে পঞ্চাশ, হাওয়া, বুক খোলা, ডানহাতে বইগুলি-
একটা কালো কোটপরা লোক অত্যন্ত সহৃদয়ভাবে আমার পা মাড়িয়ে দিয়েই
একজন স্ত্রীলোকের বুকে টোকা মারলো, স্ত্রীলোকটির ঊরু পর্যন্ত
লাল মোজা, খুবই অন্যমনস্ক দুটি আগ্নেয়গিরি তার বুকে, কাচের
এপাশ থেকে তার মুখ অন্ধকারে নিহত সারিসের মতো, সে খুব
দুঃখিত স্বরে বললো, হ্যারিংটন (হু ওয়জ হ্যারিংটন?) স্ট্রট, মনে
হল সে সারা সকাল ধরে কেঁদোছে, কেননা তার চুর্ণ চুলে রোদ পড়েছিল, সে
আমাকে দেখতে পায়নি। অদূরে যে থ্যাঁতলানো পায়রাটাকে দেখে আমি
শিউরে
উঠেছিলাম, কালো কোটপরা লোকটির আড়াল থেকে সে তাও দেখতে পেল না
সে বললো, রোক্‌কে।
বাস অনেক দূর এসেছে, সে মরা পায়রাটাকে খুঁজে পাবে না।

রোকোকো কথাটা খুব সুন্দর। যেমন বুকলিক, কিন্তু প্যাস্টোরাল
নয়, একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ তিনশো মাইল দূরে চলে গেল...
এখন হঠাৎ ময়দানে নেমে পড়লে আমি কি ফের রাখাল সেজে বাঁশী
বাজাতে পারবো? 'ভালোবাসা ছিল ভালোবাসার অনেক আগে' –

লম্বা গাছের মাথার উপরে ক্রেন ঝুঁকে আছে, নিখিলেশ কথা বলছে একটা মেয়ের সঙ্গে, মেয়েটা পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে, হাঁ করে মেয়েটা নিজের শরীরে কথা ঢোকাচ্ছে, আমি চলে যাবার পর এক মুহূর্ত ওরা চোখ বুজে ছিল, ঋষিদের মতো স্বভাবতই নিখিলেশ চোখ বন্ধ করে থাকে।
অন্ধকারে লাল গোলাপ আমার ভালো লাগা চলবে না, কেননা কমলবাবুর আগেই ভালো লেগেছে, কালো পোশাক ইয়েট্‌সের খুব পছন্দ ছিল, তার চেয়েও খারাপ...দিনের আলোয় কেন ফুটেছিস সাদা ফুল?

ছাদের টবে পেচ্ছাব করেছিলাম, সেখানে তবু সুন্দর এক ঝাড় বেলফুল ফুটেছে, না, লোকটা একটুর জন্য চাপা পড়লো না, আশ্চর্য, লোকটার হাতে একটা ক্যালেন্ডার, ক্ষমা করুন, কে যেন বললো, না, কে যেন বললো, দয়া করুন, ক্ষমা করুন, না, না, চোপরাও, না, না-অসম্ভব এমন দয়াহীন, দয়াপ্রার্থী মানুষের বীজাণু আমার কানের মধ্য দিয়ে ঢুকে যাক আমি চাই না। আমি বরং রোদ্দুরে একা।

দেখা হবে

ভ্রূ-পল্লবে ডাক দিলে, দেখা হবে চন্দনের বনে-
সগন্ধের সঙ্গে পাবো, দ্বিপ্রহরে বিজন ছায়ায়
আহা, কি শীতল স্পর্শ হৃদয়-ললাটে, আহা, চন্দন চন্দন
দৃষ্টিতে কি শান্তি দিলে, চন্দন, চন্দন
আমি বসে থাকবো দীর্ঘ নিরালায়

প্রথম যৌবনে আমি অনেক ঘুরেছি অন্ধ, শিমূলে জরুলে
লক্ষ লক্ষ মহাদ্রুম, শিরা-উপশিরা নিয়ে জীবনের কত বিজ্ঞাপন

তবুও জীবন জ্বলে, সমস্ত অরণ্য-দেশ জ্বলে ওঠে অশোক আগুনে
আমি চলে যাই দূরে, হরিণের ক্রস্ত পায়ে, বনে বনান্তরে,অন্বেষণ।

ভ্রু-পল্লবে ডাক দিলে ....এতকাল ডাকো নি আমায়
কাঙালের মতো আমি এত একা, তোমায় কি মায়া হয়নি
শোনো নি আমার দীর্ঘশ্বাস?
হৃদয় উন্মুক্ত ছিল, তবুও হৃদয় ভরা এমন প্রবাস!

আমার দুঃখের দিনে বৃষ্টি এলো, তাই আমি আগুন জ্বেলেছি,
সে কি ভুল!
শুনিনি তোমার ডাক, তাই মেঘমন্দ্র স্বরে গর্জন করেছি, সে কি ভুল?
আমার অনেক ভুল, অরন্যের একাকীত্ব অসি'রতা ভ্রাম্যমান ভুল!
এক মুহূর্তেই
সর্ব অঙ্গে শিহরণ, ক্ষণিক ললাট ছুঁয়ে উপহার দাও সেই
অলৌকিক ক্ষণ
তুমি কি অমূল-তরু, স্নিগ্ধজ্যোতি, চন্দন, চন্দন,
দৃষ্টিতে কি শান্তি দিলে চন্দন, চন্দন
আমার কুঠার দূরে ফেলে দেব, চলো যাই গভীর গভীরতম বনে।

দ্বিধা

ভালোবাসা ছিল তাই আমি অত ঘৃণায়
ডুব দিতে ভয় পাইনি
মানুষ মেরেছি রক্ত মোছার আঁচল
সামনেই ছিল, সঞ্জীবনীর আয়না
কে কাকে দেখায়, কার মুখ কার ওষ্ঠ

উষ্ণ ললাট চায় না–
ঘোরে ধাতু, ঘ্রাণ শাসন করেন হেডিস।
পাহাড়ের চূড়ায় দুঃখের কাছে যাইনি
ভালোবাসা ছিল নাকি ঘৃণা ছিল? এখন
ঠিক মনে নেই, ঠিক যেন মনে পড়ে না।

না লেখা কবিতা

কুসুমের বুক থেকে ঝরে গেছে সব পবিত্রতা; এই লাইনটা নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছি। লিখেই মনে পড়ে, না না, আমি বলতে চাই স্ত্রীলোকের শরীর থেকে সব রূপ উবে গেছে। কিন্তু এ কথাটা কিভাবে লিখবো বুঝতে না পেরে, কুসুমের বুক থেকে ঝরে গেছে ইত্যাদি। তখন মনে হয়-কেন, এভাবে ঘুরিয়ে লিখবো। কেন, সোজাসুজি লিখবো, আমার কাকে ভয়? কথাটা কি ভাবে জানাবো ভাবতে বসি।। ভাবতে-ভাবতে ঘুম পায়, মনে পড়ে-গড়িয়াহাটের ট্রাম লাইনের উপর দিয়ে পেস্বীরা শেয়ালের গলার বকলশ ধরে বেড়াতে বেরিয়েছি-কলকাতা এই রকম-এ কথাও লিখতে হবে। কিন্তু লেখার সময় আসে কুসুম, রূপের বদলে পবিত্রতা। আমি কুসুম সম্বন্ধে কি জানি? কিছুই না। পবিত্রতা সম্বন্ধেই বা কী জানি? তখন মনে হয় স্ত্রীলোকের সব রূপ উবে গেছে। তাও কি জানি? তবে কেন ঘণ্টায় যাট মাইল স্পীডে ছুটে যাওয়া একটি মেয়ের এক পলক মুখ দেখে এমন প্রেমে পড়ি যে সাতদিন আহারে রুচি থাকে না? তবে কেন বেলা বারোটায় একটি মেয়েকে ঘুমোতে দেখে এমন হঠাৎ অসহ্য কষ্ট হয়েছিল যে মনে হয়েছিল দীনের চেয়ে দীন হয়ে যাই, একবার হাঁটু মুড়ে ভিখারীর মতো। ওর হাতের স্পর্শ ভিক্ষে করি। সেইজন্যই কি কবিতাটা লিখতে গেলেই মনে পড়ে অন্য? নিরীহ কুসুমের প্রতি অকারণ কপট ক্রোধ? এইসব ভাবতে ভাবতে আমার কিছুই হয় না, বারবার ঘুম আসে। বরং যদি দুটো নিয়েই

লিখতাম। তবে দুটি কবিতা অন্তত লেখা হতো। না হয় হতোই বা ওরা কন্ট্রাডিকাটারি। তার বদলে খেলো লজিক আমাকে নিয়ে গেল মমন্তিক নিঃসঙ্গতার দিকে।

নারী ও নগরী

ওকে ডাকো, ডেকে বলে ও যেন অমন ঘুমঘোর
না দেখায় খোলা বুকে, গলিপথ বা নিয়ন আলোকে
এমন ঘুমের মধ্যে নিমন্ত্রণ কেন? যদিও কলকাতা ঘুম জানে না
তবু সে কি স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে ঘুম শিখবে ঘুঙুর ও
তবলার সঙ্গতে?

প্রণয় ও রান্না ছাড়া বাকি সব স্ত্রীলোকেরা জানে
সেও বড় কাঁচা জানা, যেমন এ শহরের ড্রেন ও হাইড্র্যান্ট
পয়ঃপ্রণালীর এই এলাহি কাণ্ডকারখানা সেও ঢের দূর
স্ত্রীলোকের প্রণালীর চেয়ে-অন্ধকার ময়দানে একলা গিয়ে
ও কি জানে চুপ করে বসে থাকতে? কলকাতা অনেক কিছু জানে।
কখনো বেশ্যার মতো নরম নর্দমা তুলে ধরে বটে, তবু
সে সব ট্রাফিক-জ্যাম ঢের ভালো, সে কি তোমাদের ছেঁড়া
মন দেওয়া-নেওয়া

বুকে শুয়ে রামকৃষ্ণ নাম কত উপকারী শরৎ শেখালো
ওকে ডাকো, ডেকে বলো, ধর্ম জীবনের অঙ্গ, ও কিছু জানে না!
ও কি জানে খুনোখুনি-চাকিতে ঝলসায় ছুরি রক্তপাত নেই-
জাঙিয়ার বুক পকেট থেকে টাকা কি ভাবে পকেটমারি হয়-
করপোরেশনের ভোটে জরাসন্ধ ছিড়ে দুই ফাঁকা হয় ফের জুড়ে যায়
চুমু খেতে হলে চাই বিনোবা ভাবের পারমিশান...

এ সব ওর শেখার, ওকে বলো ব্যবসা শিখতে নিমতলায় যাক
অথবা বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ঘুরে যাক অ্যাসেম্বলিতে–
গোয়েন্দা গল্পের কারখানায়।

নির্বাসন

আমি ও নিখিলেশ, অর্থাৎ নিখিলেশ ও আমি, অর্থাৎ আমরা চারজন
একসঙ্গে সন্ধেবেলা কার্জন
পার্কের মধ্য দিয়ে,- চতুর্দিকে রাজকুমারীর মত আলো-
হেঁটে যাই, ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ঘড়ি ভয় দেখালো
উল্টো দিকে কাঁটা ঘুরে, আমাদের ঘাড় হেট
করা মূর্তি, আমরা চারজন হেটে যাই, মুখে সিগারেট
বদল হয়, আমরা কথা বলি না, রেড রোডের দু'পাশের
রঙিন ফুলবাগান থেকে নানা রঙের হাওয়া আসে, তাসের
ম্যাজিকের মতো গাড়িগুলো আসে ও যায়, আমরা এক ভাঙা কারখানায়
শিকল কিনতে গিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি, আমি বাকি তিনজনকে
চেয়ে দেখলুম, ওরাও আমাকে আড়চোখে.... .
ছোট-বড়ো আলোয় বড়ো ছোট ছায়া সমান দুরত্বে
আমাদের, চাঁদ ও জ্যোৎস্নার মাঠে ইঁদুর বা কেঁচোর গর্তে
পা মচকে আমি পিছিয়ে পড়ি, ওরা দেখে না, এগিয়ে যায়
কখনো ওরা আলোয়, কখনো গাছের নিচে ছায়ায়
ওরা পিছনে ফেরে না, থামে না, ওরা যায়-
আমি নাস্তিকের গলায় নিজের ছায়াকে ডাকি, একশো মেয়ের চিৎকার
মেমোরিয়ালের পাশ থেকে হাসি-সমেত তিনবার
জেগে উঠে আড়াল করে, এবার আমি নিজের নাম

চেচাঁই খুব জোরে, কেউ সাড়া দেবার আগেই একটা নিলাম-
ওয়ালা 'কানাকড়ি', 'কানাকড়ি' হাতুড়ি ঠোকে, একটা ঢিল
তুলে ছুঁড়তে যেতেই কে যেন বললো, 'সুনীল,
এখানে কী করছিস? আমি হাঁটু ও কপালের
রক্ত ঘাসে মুছে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার সুবজ ও লালের
শিহরণ দেখি, দু'হাত উপরে তুলে বিচারক সপ্তর্ষিমন্ডল
আড়াল করতে ইচ্ছে হয়, 'ওঠ্ বাড়ি চল্, কিংবা বল্
কোথায় লুকিয়েছিস নীরাকে? গলার স্বর শুনে মানুষকে
চেনা যায় না, একটি অন্ধ মেয়ে আমাকে বলেছিল, দু'চোখ উস্কে
আমি লোকটাকে তদন্ত করি; পাপ নেই, দুঃখ নেই এমন
পায়ে চলা পথ ধরে কারা আসে। যেন গহন বন
পেরিয়ে শিকারী এলো, জীবনের তীব্রতম প্রশ্ন মুখে তুলে
দাঁড়িয়ে রইলো, যেন ছুঁয়ে দিল বেদান্তের মন্দিরচূড়ার মতো আঙুলে
নীলিমার মতো নিঃস্বতা,- যেন কত চেনা, অথচ মুখ চিনি না, চোখ
চিনি না, ছায়া নেই, লোকটার এমন নির্মম, এক-জীবনের শোক
বুকে এলো, 'কোথায় লুকিয়েছিস?' 'জানি না' এ-কথা
কপালে রক্তের মতো, তবু বোঝে না রক্তের ভাষা, তৃষ্ণা ও ব্যর্থতা
বার বার প্রশ্ন করে, জানি না কোথঅয় লুকিয়েছি নীরাকে, অথবা নীরা কোথায়
লুকিয়ে রেখেছে আমা! কোথায় হারালো নিখিলেশ, বিদ্যমানতায়
পরস্পর ছায়া ও মূর্তি, ' .... আবার একা হাঁটতে লাগলুম, বহুক্ষণ
কেউ এলো না সঙ্গে, না প্রশ্ন, না ছায়া, না নিখিলেশ, না ভালোবাসা
শুধু নির্বাসন।।

নিয়তি

নরকের চারপাশে কেমন কেয়ারি করা সুন্দর বাগান
আমরা দু'জনে ওই ফুল-বাগানে
বিকেলে বেড়াতে যাব আজ
হাওয়ায় উড়বে চুল, গুনগুন স্বরে প্রিয় গান
গেয়ে উঠব একসঙ্গে, কৌতুকে চকিত করে নরক-সমাজ।
গোলাপকুঞ্জের পাশে এসো এইখানে একটু বসি
তীব্র ঘন নীল আলো চতুর্দিকে উজ্জ্বল করেছে
তোমার গ্রীবার ভঙ্গি, স্তনের সবল রেখা হঠাৎ আমাকে
করে বিষম সাহসী
দেয়ালের এই পাশে আমরা দু'জনে আছি কি উল্লাসে,
উষ্ণতায় বেঁচে।
কঠিন শাস্তির ঘর থেকে ঐ যে দেখা হিরন্ময়
চেয়ে আছে আমাদের দিকে,
সুকুমার মূর্তিখনি ছিন্নভিন্ন, চক্ষু থেকে মুছে গেছে
সমস্ত বিস্ময়
গলায় ছুরির দাগ, তবু কি দর্পিত রোখ-আজ মনে হয়
আমারও সমস্ত পাপ আঙুলের নখের প্রতীকে
তোমার চুলের মধ্যে খেলা করে দ্বিধাময় আদরে সম্প্রতি;
স্বর্গের অপ্সরী হয়ে থাকবে তুমি-
হিরন্ময় ও আমার সমান নিয়তি।

নীরা ও জীরো আওয়ার

এখন অসুখ নেই, এখন অসুখ থেকে সেরে উঠে
পরবর্তী অসুখের জন্য বসে থাকা। এখন মাথার কাছে

জানলা নেই, বুক ভরা দুই জানলা, শুধু শুকনো চোখ
দেয়ালে বিশ্রাম করে, কপালে জলপট্টির মতো
ঠাণ্ডা হাত দূরে সরে গেছে, আজ এই বিষম সকালবেলা
আমার উত্থান নেই, আমি শুয়ে থাকি, সাড়ে দশটা বেজে যায়।

প্রবন্ধ ও রম্যরচনা, অনুবাদ, পাঁচ বছর আগের
শুরু করা উপন্যাস, সংবাদপত্রের জন্য জল-মেশানো
গদ্য থেকে আজ এই সাড়ে দশটায় আমি সব ভেঙেচুরে
উঠে দাঁড়াতে চাই-অন্ধ চোখ, ছোট চুল-ইস্ত্রিকরা পোশাক ও
হাতের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে আমি এখন তোমার
বাড়ির সামনে, নীরা থুক্ করে মাটিতে থুতু ছিটিয়ে
বলি : এই প্রাসাদ একদিন আমি ভেঙে ফেলবো! এই প্রাসাদে
এক ভারতবর্ষব্যাপী অন্যায়। এখান থেকে পুনরায় রাজতন্ত্রের
উৎস। আমি
ব্রীজের নিচে বসে গম্ভীর আওয়াজ শুনেছি, একদিন
আমূলভাবে উপড়ে নিতে হবে অপবিত্র সফলতা।

কবিতায় ছোট দুঃখ, ফিরে গিয়ে দেখেছি বহুবার
আমার নতুন কবিতা এই রকম ভাবে শুরু হয় :
নীরা, তোমায় একটি রঙিন
সাবান উপহার
দিয়েছি শেষবার;
আমার সাবান ঘুরবে তোমার সারা দেশে।
বুক পেরিয়ে নাভির কাছে মায়া স্নেহে
আদর করবে, রহস্যময় হাসির শব্দে
ক্ষয়ে যাবে, বলবে তোমার শরীর যেন

অমর না হয়...

অসহ্য! কলম ছুঁড়ে বেরিয়ে আমি বহুদূর সমুদ্রে
চলে যাই, অন্ধকারে স্নান করি হাঙর-শিশুদের সঙ্গে
ফিরে এসে ঘুম চোখ, টেবিলের ওপাশে দুই বালিকার
মতো নারী, আমি নীল-লোভী তাতার বা কালো ঈশ্বর-খোঁজা
নিগ্রোদের মতো অভিমান করি, অভিমানের স্পষ্ট
শব্দ, আমার চা-মেশানো ভদ্রতা হলুদ হয়!

এখন, আমি বন্ধুর সঙ্গে সাহাবাবুদের দোকানে, এখন
বন্ধুর শরীরে ইঞ্জেকশন ফুঁড়লে আমার কষ্ট, এখন
আমি প্রবীণ কবির সুন্দর মুখ থেকে লোমশ ভ্রুকুটি
জানু পেতে ভিক্ষা করি, আমার ক্রোধ ও হাহাকার ঘরের
সিলিং ছুঁয়ে আবার মাটিতে ফিরে আসে, এখন সাহেব বাড়ীর
পার্টিতে আমি ফরিদপুরের ছেলে, ভালো পোষাক পরার লোভ
সমেত কাদা মাখা পায়ে কুৎসিত শ্বেতাঙ্গিনীকে দু'পাটি
দাঁত খুলে আমার আলজিভ দেখাই, এখানে কেউ আমার
নিম্নশরীরের যন্ত্রনার কথা জানে না। ডিনারের আগে
১৪ মিনিটের ছবিতে হোয়াইট ও ম্যাকডেভিড মহাশূন্যে
উড়ে যায়, উন্মাদ! উন্মাদ! এক স্লাইস পৃথিবী দূরে,
সোনার রজ্জুতে
বাঁধা একজন ত্রিশঙ্কু। কিন্তু আমি প্রধান কবিতা
পেয়ে গেছি প্রথমেই, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫...থেকে ক্রমশ শূন্যে
এসে স্তব্ধ অসময়, উলটোদিকে ফিরে গিয়ে এই সেই মহাশূন্য,
সহস্র সূর্যের বিস্ফোরণের সামনে দাঁড়িয়ে ওপেনহাইমার
প্রথম এই বিপরীত অঙ্ক গুনেছিল ভগবৎ গীতা আউড়িয়ে?

কেউ শূন্যে ওঠে কেউ শূন্যে নামে, এই প্রথম আমার মৃত্যু
ও অমরত্বের ভয় কেটে যায়, আমি হেসে বন্দনা করি :
ওঁ শান্তি! হে বিপরীত সাম্প্রতিক গণিতের বীজ
তুমি ধন্য, তুমি ইয়ার্কি, অজ্ঞান হবার আগে তুমি সশব্দ
অভ্যুত্থান, তুমি নেশা, তুমি নীরা, তুমিই আমার ব্যক্তিগত
পাপমুক্তি। আমি আজ পৃথিবীর উদ্ধারের যোগ্য

নীরা তোমার কাছে

সিঁড়ির মুখে কারা অমন শান্তভাবে কথা বললো?
বেরিয়ে গেল দরজা ভেজিয়ে, তবু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে সিঁড়িতে
রেলিং-এ দুই হাত ও থুত্‌নি, তোমায় দেখে বলবে না কেউ থির বিজুরি
তোমার রঙ একটু ময়লা, পদ্মপাতার থেকে যেন একটু চুরি,
দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো।

নীরা, তোমায় দেখি আমি সারা বছর মাত্র দু'দিন
দোল ও সরস্বতী পূজোয়-দুটোই খুব রঙের মধ্যে
রঙের মধ্যে ফুলের মধ্যে সারা বছর মাত্র দু'দিন-
ও দুটো দিন তুমি আলাদা, ও দুটো দিন তুমি যেন অন্য নীরা
বাকি তিনশো তেষট্টি বার তোমায় ঘিরে থাকে অন্য প্রহরীরা।
তুমি আমার মুখ দেখোনি একলা ঘরে, আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, আমরা কেউ বুকের কাছে কখনো
কথা বলিনি পরস্পর, চোখের গন্ধে করিনি চোখ প্রদক্ষিণ-
আমি আমার দস্যুতা
তোমার কাছে লুকিয়ে আছি, নীরা তোমায় দেখা আমার মাত্র দু'দিন।

নীরা, তোমায় দেখে হঠাৎ নীরার কথা মনে পড়লো।
আমি তোমায় লোভ করিনি, আমি তোমায় টান মারিনি সুতোয়
আমি তোমার মন্দিরের মতো শরীরে ঢুকিনি ছল ছুতোয়
রক্তমাখা হাতে তোমায় অবলীলায় নাশ করিনি;
দোল ও সরস্বতী পূজোয় তোমার সঙ্গে দেখা আমার-সিঁড়ির কাছে
আজকে এমন দাঁড়িয়ে রইলে
নীরা, তোমার কাছে আমি নীরার জন্য রয়ে গেলাম চিরঋণী।

নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা

এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি, নীরা
এ-কবিতা মধ্যরাত্রে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে
ঘুমের ভিতরে তুমি আচমকা জেগে উঠে টিপয়ের
থেকে জল খেতে গিয়ে জিভ কামড়ে একমুহূর্ত ভাবলে
কে তোমার কথা মনে করছে এত রাত্রে-তখন আমার
এই কবিতার প্রতিটি লাইন শব্দ অক্ষর কম ড্যাস রেফ্
ও রয়ের ফুট্‌কি সমেত ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে, তোমার
আধোঘুমন্ত নরম মুখের চারপাশে এলোমেলো চুলে ও
বিছানায় আমার নিশ্বাসের মতো নিঃশব্দ এই শব্দগুলি
এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর গুণিনের বাণের মতো শুধু
তোমার জন্য, এরা শুধু তোমাকে বিদ্ধ করতে জানে

তুমি ভয় পেয়ো না, তুমি ঘুমোও, আমি বহু দূরে আছি
আমার ভয়ংকর হাত তোমাকে ছোঁবে না, এই মধ্যরাত্রে
আমার অসম্ভব জেগে ওঠা, উষ্ণতা, তীব্র আকাঙ্খা ও

চাপা আর্তরব তোমাকে ভয় দেখাবে না-আমার সম্পূর্ণ আবেগ
শুধু মোমবাতির আলোর মাতো ভদ্র হিম,
শব্দ ও অক্ষরের কবিতায়
তোমার শিয়রের কাছে যাবে-এরা তোমাকে চুম্বন করলে
তুমি টের পাবে না, এরা তোমার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকবে
এক বিছানায়-তুমি জেগে উঠবে না, সকালবেলা তোমার পায়ের
কাছে মরা প্রজাপতির মতো এরা লুটোবে। এদের আত্মা মিশে
থাকবে তোমার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে, চিরজীবনের মতো

বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঝর্ণার জলের মতো
হেসে উঠবে, কিছুই না জেনে। নীরা, আমি তোমার অমন
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করবো মনে মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে
নিজস্ব চোখে তাকাবো।
তুমি জানতে পারবে না-তোমার সম্পূর্ণ শরীরে মিশে আছে
আমার একটি অতি-ব্যক্তিগত কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা।।

নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা

এই কবিতার জন্য আর কেউ নেই, শুধু তুমি নীরা
এ কবিতা মধ্যরাত্রে তোমার নিভৃত মুখ লক্ষ্য করে

ঘুমের ভিতরে তুমি আচমকা জেগে উঠে টিপয়ের
থেকে জল খেতে গিয়ে জিভ কামড়ে এক মুহূর্ত ভাববে
কে তোমার কথা মনে করছে এত রাত্রে-তখন আমার

এই কবিতার প্রতিটি লাইন শব্দ অক্ষর কমা ড্যাশ রেফ্
ও রয়ের ফুট্‌কি সমেত ছুটে যাচ্ছে তোমার দিকে, তোমার
আধোঘুমন্ত নরম মুখের চারপাশে এলোমেলো চুলে ও
বিছানায় আমার নিশ্বাসের মতো নিঃশব্দ এই শব্দগুলি
এই কবিতার প্রত্যেকটি অক্ষর গুনিনের বাণের মতো শুধু
তোমার জন্য, এরা শুধু তোমাকে বিদ্ধ করতে জানে

তুমি ভয় পেয়ে না, তুমি ঘুমোও, আমি বহু দূরে আছি
আমার ভয়ঙ্কর হাত তোমাকে ছেবে না, এই মধ্যরাত্রে
আমার অসম্ভব জেগে ওঠা, উষ্ণতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও
চাপা আর্তরব তোমাকে ভয় দেখাবে না-আমার সম্পূর্ণ আবেগ
শুধু মোমবাতির আলোর মতো ভদ্র হিম,
শব্দ ও অক্ষরের কবিতায়
তোমার শিয়রের কাছে যাবে-এরা তোমাকে চুম্বন করলে
তুমি টের পাবেনা, এরা তোমার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকবে
এক বিছানায়-তুমি জেগে উঠবে না, সকালবেলা তোমার পায়ের
কাছে মারা প্রজাপতির মতো এরা লুটোবে। এদের আত্মা মিশে
থাকবে তোমার শরীরের প্রতিটি রন্ধে, চিরজীবনের মতো

বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে কণার জলের মতো
হেসে উঠবে, কিছুই না জেনে। নীরা, আমি তোমার অমন
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করবো মনে মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে
নিজস্ব চোখে তাকাবো।
তুমি জানতে পারবে না-তোমার সম্পূর্ণ শরীরে মিশে আছে

আমার একটি অতি ব্যক্তিগত কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা।

পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না

পাপ ও দুঃখের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না
আয়না
ভেঙে
বিচ্ছুরণ
একদিন
বিস্ফোরণ হয়
বুক ভেঙে কান্না এলে কান্নাগুলি ছুটে যায় ধূসর অন্তিমে স্বর্গের অলিন্দে-
স্বর্গ থেকে
তারপর ঢলে পড়ে
মহিম হালদার স্ট্রীটে
প্রাচীন গহ্বরে
মধ্যরাতে।

জানলা ভেঙে বৃষ্টি এলে বুকে যে-রকম পাপ হয়
যে-রকম স্মৃতিহীন মহিম হালদার কিংবা আমি ও মোহিনী
পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রী-শরীর চরিত্র নদীর.....
দীপকের মাথাব্যথা হাঁসের পালক ছুঁয়ে হাসাহাসি করে
যে-রকম শান্তিনিকেতন কোনো ত্রিভুবনে নেই
দীপক ও তারাপদ দুই কম্বুকণ্ঠ জেগে রয়.....

যে রকম তারাপদ গান গায় গোটা উপন্যাসে সুর দেয়া
কবিতার লাইন ছুঁড়ে পাগলা-ঘন্টি বাজিয়ে ঘুরেছে-

নিকষ বৃত্তের থেকে চোখগুলি ঘোরে ও ঘুমোয়,
শিয়রে পায়ের কাছে বই- বই- বই
তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র-রচনাবলী লুটোয় পাপোশে।
আরো নিজে পাপোশের নিচে এক আহিরীটোলায়
বৃষ্টি পড়ে,
রোদ আসে,
বিড়ালীর সঙ্গে খেলে
বেজম্মা বালিকা-
ছাদে পায়চারি করে গিরগিটি,

শেয়াল ঢুকেছে নীল আলো-জ্বালা গরে
রমণী দমন করে বিশাল পুরুষ তবু কবিতার কাছে অসহায়-
থুতু ও পেচ্ছাব সেরে নর্দমার পাশে বসে কাঁদে-

এ-রকম ছবি দেখে বাতাস অসহ্য হয় বুকের ভিতরে খুব
কশা অভিমানে
শব্দ অপমান করে- ভয় আমাক নিয়ে যায় পুনরায় দক্ষিণ নগরে
মহিম হালদার স্ট্রীটে ঘুরে ফিরে ঘুরে আমি মহিম, মহিম
বলে ডাকাডাকি করি, কেই নেই, মহিম, মহিম, এসো তুমি আর
আমি ও মোহিনী
ফের খেলা শুরু করি, মহিম! মোহিনী।
কোনো সাড়া নেই। ক্রমশ গম্ভীর হয় বাড়িগুলি, আলো
হাড় হিম হয়ে আসে স্মৃতিনষ্ট শীতে।।

পৌঁছোনো যাবে না

সিঁড়ির উপর থেকে ছুটে এল অতি দ্রুত মেফিস্টোফিলিস
বিশাল দুই বাহু মেলে। তেড়ে বলে উঠলো, সাবধান!
তিন লক্ষ প্রতিধ্বনি যেন বলে উঠলো, সাবধান!
এক পা উপরে গেলে বাঁ হাতের উল্টোদিকে
মারবো তোকে বিষম তুফান
উপরে বৃষ্টিতে শুধু বিষ অহর্নিশ
আমার আয়ত্তাধীন পাতালে গড়িয়ে গেছে অমৃতের ফল

এই কথা শুনে অন্ধকারে এক গোয়েন্দা ঈগল
ডানা ঝাপটে উড়ে গিয়ে বসলো টেলিপ্রিন্টারের ঘাড়ে–
নগরীর সব লোক ছুটেছে দুর্জেয় পারাবারে
শরীরের রক্তবীজ, যা ছিল প্রেমের মতো শস্তা, অনর্গল
আর জন্ম দেবে না ফসল।

আমি মধ্যপথে একায়ফ্যাটবাড়ির সিঁড়িতে, আঁধারে।
উপরে জানলার কাছে যদি একবার দাঁড়াতাম
ভাঙা আয়নার মতো অসংখ্য রূপসী সেই রুগ্‌ণ মেয়েটির
সমস্ত শরীর ছুঁয়ে, কী জানি সম্পন্ন হতো কিনা মনস্কাম
অথবা মানস নেই, অস্তিত্ব ভাঙার শব্দ প্রতিধ্বনিময়।

প্রত্যেক তৃতীয় চিন্তা

মানুষের মতো চোখ, বিস্ফোরণ, সমাধির মতো শূন্যে প্রচ্ছন্ন কপাল

পদচুম্বনের মতো ভালোবাসা ভিতরে রয়েছে
ভালোবাসা তিনশো মাইল দূরে গিয়ে আলিঙ্গন করে
দূর থেকে ভালোবাসা দেখে যেতে লোভ হয়, শরীর লুকোতে চায়
জ্যোৎস্নালোকে, তবুও জ্যোৎস্নায়
স্পষ্ঠ ছাড়া পড়ে এত স্পর্শকাতরতা।
গোলাপের মতো এক ধানক্ষেত, পুরুষ নামের সব নদী
বড় চেনা লাগে, দুঃখে কোনো পাপ নেই- যত ডুবে যাই ততই ঈশ্বর
মেঘমাশ্লিষ্টসানু পা ছড়ান, সুর্যাস্তের মতো তাঁর দুঃখ এত বড়
অথবা দুঃখের মধ্যে লোভ, কিংবা লোভের ভিতরে মুক্তি, মুক্তির ভিতরে
একজন্ম নিমগ্নতা-
এ যেন গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরা, কোথাও বাতাস নেই তবুও গাছের
এক একটা পালক খসে; দোকান ঘুমোয়- তবু ভিতরে আলোয়
আধোজাগা স্ত্রীলোকের হাসাহাসি- ওসব দোকানে দিনমানে
স্ত্রীলোক বিক্রীত হয় না- আমি খুব ভালোভাবে জানি।
অথবা দুপুরে লরী সুরকি ঢালে-সুরকির ভিতরে কোন স্বপ্ন নেই?
অমন নরম ওরা, কিশোরীর হাতে ডোবা লাল- যেন রোদ্দুরে হাওয়ায়
বিশাল প্রসাদ এক দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐ সুরকি জমা স'পে পা ডুবিয়ে-

ঘড়ি চলে কুকুরের মতো শব্দে, অথবা কুকুর ডাকে ঘড়ির মতন
তড়িঘড়ি, আমার নিশ্বাস আরও দ্রুত-যেন বেড়াতে এনেছে-
এর ফাঁকে আমায় কিছু আন্তরিক ছোট ছোট কথা বলে যাবে
টুরিস্ট গাইডের হাসি যতখানি আন্তরিক হয়
চারদিকে দেয়াল বা দেবদারুশ্রেণীর মতো প্রতিদিন দিন
প্রতিটি বিদেশ যেন চুম্বকের ধাতু দিয়ে গড়া
কোথাও আঁধারে আসে তিনটে ছায়া, সেই ছায়াবহ ভয়,
প্রতি মানুষের পবিত্রতা

তবু কোনো কোনো দিন ডাকে, বহু ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ, ইচ্ছে হয় বলি
চুল খোলো, বোতামের শব্দ শুনি, না-খোলা শায়ার মধ্যে হাত
অথবা চোখের জল চোখ থেকে ছেনে নিতে যাই
শীতে অবেলায় আমি, বাতাসে রেণুর মতো কান্না ভাসে, আমার ও
প্রতি মানুষের
মাঝে মাঝে বড় অসহায় লাগে, তখন কোথায় মুখ লুকাবো জানি না।

প্রেমবিহীন

শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রি রাজপথ
ঝকমক করে কঠিন সড়ক, আলোয় সাজানো, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে
প্রতীক্ষা আছে আঁধারে লুকানো তবু জানি চিরদিন
এ-পথ্ থাকবে এমনি সাজানো, কেউ আসবে না, জনহীন, প্রেমহীন
শেষ ভালোবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে!

রূপ দেখে ভুলি কী রূপের বান, তোমার রূপের তুলনা
কে দেবে? এমন মূঢ় নেই কেউ, চক্ষু ফেরায়, চক্ষু ফেরাও
চোখে চোখে যদি বিদ্যুৎ জ্বলে কে বাঁচাবে তবে? এ হেন সাহস
নেই যে বলবো; যাও ফিরে যাও
প্রেমহীন আমি যাও ফিরে যাও
বটের ভীষণ শিকড়ের মতো শরীরের রস
নিতে লোভ হয়, শরীরে অমন সুষমা খুলো না
চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও!
টেবিলের পাশে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালে তোমার
বুক দেখা যায়, বুকের মধ্যে বাসনার মতো

রৌদ্যের আভা, বুক জুড়ে শুধু ফুলসম্ভার,-
কপালের নিচে আমার দু'চোখে রক্তের ক্ষত
রক্ত ছেটানো ফুল নিয়ে তুমি কোন্ দেবতার
পূজায় বসবে? চক্ষু ফেরাও, চক্ষু ফেরাও, শত্রু তোমার
সামনে দাঁড়িয়ে, ভূরু জল্লাদ, চক্ষু ফেরাও!
তোমার ও রূপ মূর্ছিত করে আমার বাসনা, তবু প্রেমহীন
মায়ায় তোমায় কাননের মতো সাজাবার সাধ, তবু প্রেমহীন
চোখে ও শরীরে এঁকে দিতে চাই নদী মেঘ বন, তবু প্রেমহীন
এক জীবনের ভালোবাসা আমি হারিয়ে ফেলেছি খুব অবেলায়
এখন হৃদয় শূন্য, যেমন রাত্রির রাজপথ।।

বহুদিন পর প্রেমের কবিতা

বুকের ভিতরে যেন মুচড়ে উঠলো একুশে এপ্রিল
একুশে এপ্রিল, ওকি চুলের ভিতরে কার ক্ষীণ বজ্রমুষ্টি?
বিষম লোভের মধ্যে ছুটোছুটি-দুর শহর, অব্যক্ত মন্দিরে
ব্রীজের অনেক নিচে চাঁদ, আঃ সহ্য হয় না। এমন জ্যোৎস্নায়
জলের বিমর্ষ শব্দ, এক আনার টিকিট পেরিয়ে
ওপারে পৌঁছুলে ট্রেন, স্টেশনের একুশে এপ্রিল
রাত্রি দিয়েছিল।

চোরকটা ভরা মাঠে মরা সাপ, যেও না ডিয়ার
আর ও দিকে, দূরে কাছে কোথাও বা অপর সাপের
অসহবাসের কষ্ট অতি বিষ হয়ে আছে, আমি
মেয়েসাপ বড় ঘৃণা করি...এত চাঁপা ফুল কোথায় ফুটেছে

এমন সতেজ গন্ধ...অথবা কি বী-হাইভ ব্রাণ্ডির?
কখন খেয়েছো? আঃ! হোল্ড মি টাইট, আঃ, এমন ধারালো
নোখ রেখো না, উঁ, আ, হুঁ হুঁ উঁ, আঃ, আঃ, আ-
বিষ নেই আমার ঠোঁটে বা জিভে বিষ নেই, মৃত্যু নেই, আ
হোল্ড মি টাইট ডিয়ার,...আমার শরীর নেই কাকে ধরবে, আ-
বিষ দিও না ঠোঁটে, প্লিজ, জরায়ুর মধ্যে একটা বিষপিণ্ড দিও না
আ-উঁ, উঁ, উঁ, উঃ, লাগে, লাগে আঃ আরো মারো; আমাকে
নিষ্ঠুর ভাবে মারো!

কে ছিল তোমার সঙ্গে মা শেরি, কে ছিল সেই একুশে এপ্রিল?
ইংরেজি সোহাগ বাক্য কে বলেছে? অতি ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নারাতে
মানুষ বিষম অন্ধকার হয়
চোখ মুখ চেনাযায় না, ভিজে ঘাসে শরীরে শরীর...
আ আম সিনা, সিনা দা পোয়েট, কে তোমায় বলেছিল ফিসফিসিয়ে, আমি?
দেখো এই করতল, অবিশ্বাস কত রুক্ষ, এই চোখ দেখে বোঝা যায়
কতদিন পলক ফেলেনি, কলকাতা শহরে কোনো কবি নেই, সবাই পুলিশ
তাই ট্রাফিকের এত গণ্ডগোল, লণ্ঠন জ্বালার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডে কতটা সুবিধে
সকলেই জেনে গেছে,...আমার মাথায় শীত, মাংসের বাজারে
ভয়াবহ নামডাক, সরলতা ছিল সেই সন্ধেবেলা, আজ
আমাকে আবার তুমি ডাক দেবে? কোথায় নদীর সেই ছলচ্ছল শব্দ, দূরে
বিষণ্ণ মাল্লার গান-সেদিনের কথা ভেবে কেন আজ খুশির বদলে
বুক ভরে কুয়াশায়, চোখ জ্বালা করে ওঠে, যেন একজীবন
গাছের ছায়ায় একা বসে আছি, কোনোদিন নারীর হৃদয়ে
হেলাইনি এই মাথা, বিস্মরণে এত কৃতঘ্নতা,
এবার ফিরিয়ে নাও একুশে এপ্রিল।
এবার ফিরিয়ে দেবো একুশে এপ্রিল আমি, ও মুকুট আমায় মানায় না।

বায়ু, তুমি

বায়ু, তুমি আমাকে পবিত্র করো, আমার প্রতিটি রক্ত কণিকাকে ডাক দাও, ডেকে বলে প্রতিটি বিষাঞ্জ জন্ম। ওদের প্রত্যেককে স্নান করিয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে সুগন্ধ দাও-যেন আর কোনোদিন অন্ধকার সিঁড়ির নিচে অতর্কিতে ছুরি হাতে না দাঁড়ায়-।

বিড়াল

হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠলো ধড়মড়িয়ে বিমলা
ও কে গেল, কে পালালো, ও দস্যু,...
মায়ের পাশে শুয়েছিল, হঠাৎ কেউ ছিঁড়লো বুকের জামা
সারা শরীর জুড়ে রইলো নখের দাগ, বুকটা অমন গরম
করে গেল
ও কে গেল, কে পালালো, ও দস্যু-
ও কেউ নয়, ভয় পাসনি বিমলা,
ও তোর বিড়াল
চুরি করে মাঝরাত্রে দুধ খেয়ে পালালো!

বড় বেশি

বড় বেশি ভালোবাসা দিয়েছিলে চরিত্র দুষিত হয়ে গেল
সেই কারণে

কী করে খরচ করবো সে সম্পদ, অথচ জমিয়ে রাখা
যায় না কিছুতে
পচে যায়, গন্ধ হয়, সমস্ত শরীরে
প্রণয়ের পচা গন্ধ, পাশের চেয়ারে কেউ ঘৃণায় বসে না।

অমন দু'হাত তুলে বুকের উপরে দয়া না দেখালে আরক্ত সন্ধ্যায়
চমৎকার চলে যেতম আধার জগতে;
ধৈর্যহীন পুরুষের মুখখানি বুকের সংকটে
না রাখাই ছিল ঠিক, কেননা অতলে
ফেরে না চোখের যাত্রা; শরীর ফুরিয়ে গেলে তবুও চোখের
ভয়ঙ্কর পথখানি অস্থির গর্জন করে নিজস্ব বিভায়

তার বদলে ঘাড় হেঁট করে থাকা যেত অনায়াসে।

ভ্রমণ

চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একা, অহঙ্কার অত্যন্ত গম্ভীর
নাকের ক'লক্ষ শিরা কাঁপে যেন ঠোঁট ওল্টায় চিবুক পর্যন্ত
শরীর বিমর্ষ নয়-হাঁসের পালকসম ভারী অনুরাগী
গোধূলির, জলপ্রপাতের, কুচো আমিষের, হলুদ স্বর্গের
চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি যেমন দাঁড়ানো যায় একা
যেমন দাঁড়ানো যায় জলে
পর্বত শিখরে
যেমন হঠাৎ মুখ পাখিদের সঙ্গে উড়ে যায়
মুখহীন চেয়ে থাকা যেমন শৈশব থেকে ভাসে
সিন্দুকের ঝনাৎকার, সীমানা ছাড়িয়ে যায় লক্ষ

বিকেলের ওড়াওড়ি
যেমন দাঁড়ানো যায় একাহিম স্ত্রীলোকের বুকের ভিতরে।

কে যেন স্বর্গের থেকে চ্যুত হয় অহরহ, চুত হয় স্বর্গেরও পরিধি
সটান ভূপৃষ্ঠে নয়, আরো নিচে, পাতাল বা খ্রীস্টান নরকে নরকে
প্রবাসী আছি বহুকাল, চিঠি লিখো,
কেয়ার আর অনুতাপ শাখা
সোনালি সাপের চোখ ডাক পিয়নের মতো উৎকণ্ঠা ওড়ায়
সায়াহ্নের স্নান যত্ন...ভেঙে যায় চিৎকারের গলা
আবার হঠাৎ যেন ফিরে আসে প্রহরী ও সবুজ নিশান
এক বৃষ্টিপাত
আবার হঠাৎ যেন ফিরে আসে বহুমুখ,
অন্ধকারে ফুলের উত্থান-

পতনের পদশব্দ হয়
সুনীল সুনীল বলে ডাক দেয় পার্কের রেলিং-
এ মৃত্যু ও মায়ের কণ্ঠ পরস্পর বিপরীত দিকে ছুটে যায়-
আবার হঠাৎ ঘুম ঘুমের ভিতর থেকে ডুবন্ত দ্বীপের
রঙ কিংবা নিবেদন নিয়ে আসে, প্রেতকণ্ঠে সুনীল সুনীল
হিজল বনের পাশে খোলা প্রান্তরের দিকে ভাসে।
জাগরণ কোনোদিনও ক্ষমাশীল নয়, যেন জাগরণ বহু জাগরণ
যেমন নারীর ঘুম শরীরের কলরবে খেলা
যেমন রাত্রির মধ্যে ভিজে পায়ে বাড়ি ফেরা,
অন্ধকারে চোখ ভিজে যায়
ভালোবাসা খুঁজে নেয় ঘাতকের চক্ষু, বুক পেতে দেয়
ছুরির সম্মুখে

কোনো কণ্ঠস্বর কোনো উত্তর জানে না–
স্বর্গ নরকের চেয়ে কতখানি দূরে থাকে কবিতার খাতা?

মহারাজ, আমি তোমার

মহারাজ, আমি তোমার সেই পুরনো বালক ভৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না? তোমার বুকে হোঁচট পথে
চাঁদের আলোয় মোট বয়েছি, বেতের মতো গান সয়েছি
দু'হাত নিচে, পা শূন্যে- আমার সেই উদোম নৃত্য
মহারাজ, মনে পড়ে না? মহারাজ, মনে পড়ে না? মহারাজ,
চাঁদের আলোয়?

মহারাজ, আমি তোমার চোখের জলে মাছ ধরেছি
মাছ না মাছি কাঁকরগাছি একলা শুয়েও বেঁচে তা আছি
ইষ্টকুটুম টাকডুমাডুম, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ!
অমন তোমার ভালোবাসা, আমার বুকে পাখির বাসা
মহারাজ, তোমার গালে আমি গোলাপ গাছ পুঁতেছি-
প্রাণঠনাঠন ঝাড়লণ্ঠন, মহারাজ, কাঁদে না, ছিঃ!

মহারাজ, মা-বাপ তুমি, যত ইচ্ছে বকো মারো
মুঠো ভরা হাওয়ার হাওয়া, তো কেবল তুমিই পারো।
আমি তোমায় চিম্‌টি কাটি, মুখে দিই দুধের বাটি
চোখ থেকে চোখ পড়ে যায়, কোমরে সুড়সুড়ি পায়
তুমি খাও এঁটো থুতু, আমি তোমার রক্ত চাটি
বিলিবিলি খান্ডাগুলু, বুম্‌ চাক ডবাং ডুলু
হুড়মুড় তা ধিন্‌ না উসুখুস সাকিনা খিনা

মহারাজ, মনে পড়ে না?

মালতী

স্বপ্ন ভুল দেখা হলো, তবু এ অন্ধকারে
জেগে ও ঘুমোতে ভালো লাগে, কে বারেবারে
জ্যোৎস্না ফুলের মধ্যে নির্জন মুখ গুঁজে
বসে থাকে? ভোর রাত্রি যেন আমায় খুঁজে
হাওয়ায় উড়াল দিয়ে এলো চাইবাসায়,
স্বপ্নে বহু কথা হলো ছেকাছেনি ভাষায়
ডাক বাংলোর মাঠে, মালতী অত ভোরে
চোখ বুজে জেগে ছিল, আমি কি ঘুমঘোরে
এক থেকে বহু হই? তার আঁচল ছিঁড়ে
স্তন ও হৃদয় দেখি আড় চোখে, গভীরে
অবিশ্বস্ত পরিতাপ, চার বন্ধু আমরা
পাঁচ টাকা নিয়ে খেলি।
অনেক রক্তক্ষরা
স্বপ্নের বিষাদে মুখ পরস্পর ফিরিয়ে
শরীরের পাঁচ টাকা দুই মুঠিতে নিয়ে
আমাদের খেলা হয়, হয় না শেষ খেলা
বারবার জেগে উঠি, এদিকে ঢের বেলা।

মায়াজাল

দেড় বছর পর অমন চোখ তুলে প্রথম তাকালে
নীরা, তুমি কেমন করে আমায় এমন লোভহীণ
চৌকো টেবিল, দুপাশে নশ্বর আলোর পদরেখা
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
মুখের পাশে ঘোরে ধূপের গন্ধ, যেমন ছবিময় পারস্য গালিচা
হাসির ভাঙা স্বর, আলতো সন্ধ্যায় দু' গজ দূর থেকে পরস্পর-
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন?

দরজা বন্ধ ও জানলা খোলা, নাকি জানলা বন্ধ খোলা দরজায়
মানুষ আসে যায়, 'বিদেশ থেকে কবে ফিরলে সুনীল?'
আমার উত্তরে তোমার জোড়া ভুরু, ঈষৎ চশমায় লাস্য, অথবা
সব রকম কাঁচে ছবিও ফোটে না!
তোমার নামে আনা ছোট্ট উপহার ফিরিয়ে নিয়ে যাই লুকিয়ে
নীরা, তুমি কেমন করে করলে আমায় এমন লোভহীন
শুধু ও দুটি চোখ, শুধু ও দুটি চোখ দেখতে এতদূর
ছুটে এলাম?

মুখ দেখাদেখি

তুমি আমার লুকানো মুখ তুলে ধরলে বারান্দার আলোর কাছে
তোমার একটু ভয়ও করলো না?
দেরাজ খুলে টেনে আনলে পুরোনো চিঠি আলোর কাছে
তোমার একটু ভয়ও করলো না?
গালে তোমার পাঁচটা আঙুল বসিয়ে দিলুম রাগের আঁচে
তোমার একটু ভয়ও করলো না?

মুখের দিকে আমনভাবে আরেকবার হাঁ করে তাকালে
আরও পাঁচটা আঙুল পড়বে তোমার ঐ ননীর মতো গালে।

মুখ লুকোই, মুখ লুকোও, দুজনে বসি দুই দেয়ালে ফিরিয়ে মুখ
কথা বন্ধ, শব্দ বন্ধ, এখন
বুকের ভিতর চোখ ডুবিয়ে পালিয়ে যাই, বুকের মধ্যে এত অসুখ
কথা বন্ধ, শব্দ বন্ধ, এখন বুকের মধ্যে তোমার মুখ, তোমার বুকের আরও ভিতরে আমার মুখ

পরস্পর নিস্পলক তাকিয়ে আছে কি না
দেখার আগেই কোন সাহসে, সুদক্ষিণা
বারান্দার আলোর কাছে অমান দীনহীনার
মতো দেখতে চাইলে আমার এই অনিত্য মুখ?

মৃত্যুদণ্ড

একটা চিল ডেকে উঠলো দুপুর বেলা
বেজে উঠলো, বিদায়,
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি, বিদায়
বিদায়, বিদায়!
ট্রামলাইনে রৌদ্র জ্বলে, গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়েছিলাম আমি
হঠাৎ যেন এই পৃথিবী ডেকে দেখালো আমায়
কাঁটা-বেধাঁনো নগ্ন একটি বুক;
রূপ গেল সব রূপান্তরে আকাশ হল স্মৃতি
ঘুমের মধ্যে ঘুমন্ত এক চোখের রশ্মি দেখে
অন্ধকারে মুখ লুকালো একটি অন্ধকার।

হঠাৎ যেন বাতাস মেঘ রৌদ্র বৃষ্টি এবং
গলির মোড়ের ঐ বাড়িটা, একটি-দুটি পাখি
চলতি ট্রামের অচেনা চোখ, প্রসেশনের নত মুখের শোভা
সমস্বরে ডেকে বললো, তোমায় চিরকালের
বিদায় দিলাম, চিরকালের বিদায় দিলাম, বিদায়;
চতুর্দিকে প্রতিধ্বনি, বিদায়, বিদায় বিদায়।।

মেয়েদের জন্য ভুল ছন্দে

তোমাদের জন্য বড় দুঃখ হয়, মেয়েরা, প্রায় দশ বারো বছর
কবিতার রাজ্য থেকে কবির দল উদ্বাস্তু করেছে তোমাদের,
আগে ছিলে স্বপ্নে কিংবা পার্কে কিংবা অন্ধকারে এবং সহস্যে
রাশি রাশি কবিতায় ভঙ্গি দিতে
বাঁদিকের একটা ভাঙা পাঁজরার জানোলা দিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে
ছোকরা কবিদের প্রাণ নখে ধরতে, সাইরেনের বাঁশিতে ভুলিয়ে
ওদের মগজে বসে নিজেদের রূপশ্রীর বন্দনা লেখাতে।
হায়, আজ তোমাদের নিঃসঙ্গ সৌন্দর্যের জন্য বড় দুঃখ হয়।

যদিও সম্প্রতি দেখছি তোমাদের শরীরের বাহার খুলেছে আরও বেশি
চামড়ায় মসৃণ গন্ধ, বুকটুক চমৎকার, দাঁত দেখলে আরও কথা শুনতে
ইচ্ছে হয়
ওষ্ঠাধর ভেজা ভেজা, শীতের দেশের মতো হাসাহাসি পোশাকের নিচে
এসব কিসের জন্য, এই দ্রুত জেগে ওঠা, প্রতীক্ষার তীব্র আক্রমণ?
সন্ধের পরেও বাড়ির বাইরে থাকতে পারো, একা একা সব রাস্তা চেনা
বিবাহের আগেই এই পৃথিবীটা ধ্বংস হবে কিনা ঠিক না জেনে

বায়োলজিকাল ফুর্তি করা চলে, সাতজনের সঙ্গে এক সুরে হল্লা করে
অন্তত সাতটি আত্মা নিয়ে খেলা যায়–মনে হয়, ওদিকে যে সাতজন
বদমাইশ
ঊনপঞ্চাশ বায়ুপকেটে ভরেছে, ওরা ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁয়ে
রক্ত খাবে, ফাঁকা ঘর পেলেই করবে বিষম গুণ্ডামি
এবং পরের দিন পড়ন্ত বিকেলে আর বকুল গাছের নিচে দাঁড়াবে না।

প্রেমের ভাষায় খুব উন্নতি হয়েছে এই দু'হাজার বছর চর্চায়
না ভেবেই বলা যায় ঝকঝকে, কে আর বিশ্বাস করে ওসব ইয়ার্কি
কবিতার পাগলামি থামেনি যদিও, আজও নাকি যুবকেরা রক্ত দিয়ে
কবিতায় মাতামাতি করে
সেই রক্তে তোমরা নেই, হায় মেয়েরা, তোমরা বিমানে আছো, মন্ত্রীত্বে বা
আদালতে, সিংহাসনে, বিদেশ মিশনে,
এমনকি ঘরেও আছো, সব সময় আশেপাশে খেতে বসতে শুতে
শুধু কবিতায় নেই, আহা, এ কোথায় চলে এলে নিঃসঙ্গ নির্মম নিবার্সনে।

রাখাল

লাল ও সবুজ আলোর মধ্যে অন্তকাল
আমি ডাইনে তাকাই পিছনে ফিরে অন্ধকার গলিতে
অনন্তকাল পিছনে নয়, ডাকদিকে নয়, সবুজ ও লাল-
সুখের মতো ভূবিস্তৃত, ঊরুদ্বয়ে শোকের মতো, দৃষ্টি থেকে ঘুমের মতো
পেরিয়ে যাই, কুসুম এবং ফলের কাছে বীজের মতো
দীক্ষা নিতে,
মৃত্যু থেকে সঙ্গোপনে শুন্য ঘরে, দ্রাক্ষাবনের
ছঅই বাতাস, জ্ঞানী মাথার খুলী, নদীর ভাঙ্গা পাড়ের শুকনো পাতা-

পেরিয়ে যাই মাঝরাতের পাঠশালার হাজার চোখ, ধূসর খাতা,
পেরিয়ে যাই ভূমিকম্প, সূচের সরুগর্ত দিয়ে অনন্তকাল
রেশমী প্যান্ট, কোমরবন্ধ, হাতে চুরুট; তবু আমায় বলো, 'রাখাল' ।।

রাত্রির বর্ণনা

সম্রাজ্ঞী বাইরে আছেন, শেষ রাত্রে গোপনে ফিরবেন
দ্বার খুলে দিও রক্ষী, ঘুমের অপর নাম মৃত্যু, মনে রেখো।
ততক্ষণ দাসীদের সঙ্গে কিছু মস্করায় সময় কাটাতে পারো হয়তো,
রূপসী রমণীদের সব দিতে পারো, শুধু দৃষ্টি বাঁধা দিও না ক্ষণেকও।

পৃথিবী দেওয়ালে ক্ষুদ্র, শুমরে ওঠে বন্দীশালা, কিন্তু দেখো
চোখের তারায়
একটি সহস্রদল নীল পদ্ম ফুটে আছে, রাত্রির আকাশ–
অথবা সমুদ্র বুঝি সহস্র মন্দার পুষ্পে, প্রতীক্ষায়, সজ্জিত রয়েছে
একটি দেবদারু বৃক্ষ চিরকাল একা থেকে শুষে নিচ্ছে পৃথিবীর সুচারু নিশ্বাস।

প্রহরের ঘণ্টা বাজে, হে প্রহরী, রক্তের গমন ধ্বনি কখনো
শুনেছো?
যারা ঘুমে ঢলে আছে, তারা সব মৃত-রক্তে,
অন্ধকারে মগ্ন থেকে যাবে।
তিন বেদনার দীক্ষা নিঃস্ব বাদুড়ের মতো শূন্যপথে দিয়ে যাবে
নিলিপ্ত ত্রিকাল
তোমার ললাট জ্বলবে নীল শিখায়, দুই চক্ষের রহস্যের
অন্তরাল পাবে।

সম্রাজী বাইরে আছেন, শোনো রক্ষী, খুলে দিতে হবে সিংহদ্বার
তঞ্চক ইন্দ্রিয়বর্গ যেন না লুকায় ইতস্তত
জীবনের ধৃতি-রূপ তিনটি আদিম দুঃখে শস্ত্রপাণি হয়ে থেকে তুমি
অকস্মাৎ বুঝতে পারবে সব পদপাত শব্দ, শোণিত প্রবাহ অন্তর্গত।

শব্দ ১

তখন দরজায় স্পষ্ট শব্দ শোনা যায়, উদ্ভিদের পদশব্দ–
মাতৃজঠরের
ভিতরে শিশুর হাসি, সরল, অথবা দুই প্রতীক্ষিত ঘড়ি
দুদিকে দেয়াল জোড়া বিপরীত আয়না থেকে বহু লক্ষ ঘরের ভিতরে
পরস্পর কথা বলে, এ ছাড়া সমস্ত দৃশ্য চুপ।

আমার মুখের মধ্যে জিভ নেই, দাঁত নেই, অধরোষ্ঠীহীন, বারান্দায়
শার্ট প্যান্ট শুকোচ্ছে রোদে, গেঞ্জি উড়ে গেছে ডাস্টবিনে
ডাকবাক্সে চিঠি ছিল ভোরবেলা, খালি খামে ডাকটিকিট
ভিতরে শরীর নেই, হাস্যকর, শুয়ে আছে টেবিলে ধুলোয়–
এমনকি মেয়েরাও শব্দহীন, বুকের ভিতরে হাসি, কান্না-ক্রোধ
পোকার মতন
খেলা করছে, টেলিপ্রিন্টারের শব্দে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট, মন্ত্রী, বন্যা
থেমে গেছে
ভগ্ন প্রেমিকের ছুরি ঝলসে উঠলে
প্রতি-নায়িকার কণ্ঠে আর্তনাদ নেই

শুধু আছে উদ্ভিদের পদশব্দ, অজাত শিশুর হাসি; এবং ঘড়ির গূঢ় আলোচনা,
দূরে ফুল ফোটার কলরব, জলাশয়ে মাছের চিৎকার।

জ্যোৎস্না নিবে গেলে তবু অন্ধকার নেই, আর শব্দ থেমে গেলে
তবু অমোঘ গোলমাল
জেগে থাকে, হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করা ভালোবাসা ঘুমোতে পারে না
কবিতায়। স্বপ্নে, শোকে, কুমারী মেয়ের গন্ধে বিষঙ্গ বাতাস
চর্তুদিকে, সব মানুষের মুখ ভাঁটফুলের মতন অশ্লীল মনে হয় এক সময়,
আমার আত্মীয় কোনো ঘড়ি নেই, আয়না নেই, আমার জন্মের শব্দ–
প্রথম দিনের সেই প্রিয় শব্দ মনে আছে, কিংবা মনে নেই।

শব্দ ২

আমায় অনুসরণ করে আঠাশ বছর পেরিয়ে আসা শব্দ
যেন তাকায় অতিকুসীদ, যেন হরণ দাবি করে
যেন আমার বুকের মধ্যে তুঁত পোকার মতো নড়ে
অনুসরণ অনুসরণ শব্দ শব্দ ওঁ শব্দ

অতিক্ষিদেয় খেয়েছিলাম সাতশো বিবেক, শব্দ বললো, ‘আমি আছি’
শব্দ আমায় ট্রাম ভাড়া দেয়, বায়োস্কোপে টিকিট কাটে
খুনের রক্তে চোখ ভেসে যায়, দৈবে ঘুরি ঘোর ললাটে
অন্ধকারে মুখ দেখি না মুখের ভয়ে, শব্দ বললো, ‘আমি আছি!’ ওঁ শব্দ
আঠাশ বছর পবিত্রতার তুক শেখালো, বিনা সুদে আগাম লগ্নী
ওঁ স্বর্ণ ওঁ প্রেম ওঁ বেশ্যা ওঁ মধু ওঁ ভুঃ ওঁ দুঃখ
ওঁ ছায়া ওঁ কাম ওঁ মায়া ওঁ স্বর্গ ওঁ পাপ ওঁ অগ্নি

আঠাশ বছর শিল্প ভেবে হাতে রইলো সবুজ খড়ি
এখন এলাম ঋণের ভয়ে ইস্টিশনে তড়িঘড়ি
কেউ দেখেনি শরীর আমার শরীরীভূত, জ্বলে উঠলো তবু হঠাৎ

নাদ অগ্নি। ওঁ অগ্নি
আঠাশ বছর অনুসরণ যেন হরণ দাবী করে
যেন আমার বুকের মধ্যে তুঁত পোকার মতো নড়ে
অনুসরণ অনুসরণ শব্দ শব্দ মৃত্যুশব্দ। ওঁ শব্দ।

শুধু কবিতার জন্য

শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম, শুধু কবিতার
জন্য কিছু খেলা, শুধু কবিতার জন্য একা হিম সন্ধেবেলা
ভূবন পেরিয়ে আসা, শুধু কবিতার জন্য
অপলক মুখশ্রীর শান্তি একঝলক;
শুধু কবিতার জন্য তুমি নারী, শুধু
কবিতার জন্য এত রক্তপাত, মেঘে গাঙ্গেয় প্রপাত
শুধু কবিতার জন্য, আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে লোভ হয়।
মানুষের মতো ক্ষোভময় বেঁচে থাকা, মুধু কবিতার
জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি।

শেষ যাত্রী

শেষ ট্রেন ছেড়ে গেছে, এখন এ প্ল্যাটফর্মে আমরা সকলে
হাঁটু গুজে বসে থাকবো, সারারাত আলো জ্বলবে স্থির
শ্মশানযাত্রীর মতো ঘুমচোখে কালাহরণের খুব শান্ত কৌতুহলে
কম্বলে শরীর মুড়ে আমরা সব বসে আছি অস্পষ্ট, গম্ভীর।

শেষ ট্রেনে কারা গেল? আমাদেরই মাসতুতো ও পিসতুতো ভায়েরা,

রাত্রির পোশাক পরে বাঙ্কে চেপে এতক্ষণে ঘুমুচ্ছে আরামে
চিরকাল ঘড়ি বেঁধে ঠিক-ঠিক ট্রেনে চেপে মহা সুখে চলে যাবে এরা
পৃথিবীর সব দ্রব্য অনেক যাচাই করে কিনে নেবে ঠিক-ঠিক দামে।

আমরা সব কটা ট্রেন ছেড়ে দিয়ে প্রতিদিন প্ল্যাটফর্মে থাকবো এ- ক'জন
পাখির নখের মতো–উপমায় বলতে গেলে–গায়ে বেঁধে শীতের বাতাস,
ঘুরঘুরে পোকার মতো হকারেরা একে-একে লাভের হিসেবে দেয় মন
শহরের গৃহস্থেরা রাত্রির পরম ব্রত এই প্রহরে মানবে বারোমাস।

স্টেশনের কিছু দূরে ব্রিজ, তার নিচে এক রাত্রি-জাগা নদী
শীতল নিশ্বাস নেয়,
আমারও বুকের মধ্যে অন্ধকার জল–
আহা ঠিক এ-সময়ে এক ভাঁড় চা পেতাম। যদি!

পাওয়া গেল, টাকার খুচরোয় কিছু ঘাটতি হলো, দু'তিনটে অচল।

সকল ছন্দের মধ্যে আমিই গায়ত্রী

ছিলাম বাসনা-লঘু, ছন্দ এসে আমাকে সুসি'র হতে বলে
প্রিয় বয়স্যের মতো তার দন্তপঙ্‌ক্তি
আমি তাকে দূর হয়ে যেতে বলি নতুন বন্ধুর খোঁজে
আমি ছন্দহীন হতে হতে ক্রমশ ধর্মদ্রোহী আগোপন
পাষন্ড হয়ে যাই।
তবু সে দরজার কাছে মুখ চুন, আমি তাকে পালঙ্কের নিচ থেকে
জুতো মুখে করে আনতে হুকুম করেছি!
দ্বিধা নেই, সে এনেছে, সমালোচকের কানে মেরেছে চপ্পল।

সে আমার হাত ধরে স্ফটিকবর্ণের এক নারীর সান্নিধ্যে
টেনে আনে, মাত্রাহীন আঙুল তুলে নারীকে দেখিয়ে বলে,
সকল ছন্দের মধ্যে এই যে গায়ত্রী, তুমি নাও,
গায়ত্রীর মতো নারী শুয়ে আছে, বিশাল জঘন মেলে,
পর্ব ভেঙে ইশারায় আমাকে উপুড় হতে বলে
আমি তার শরীর বিস্তৃত করি, দুই বক্ষোদেশ ছিঁড়ে ক্রমশ পয়ারে
নিয়ে আসি, ঊরুদ্বয়ে কিছু কথ্য অশ্লীলতা মিশিয়ে চকিতে
খুলে ফেলি আরবের অলঙ্কার, যদিও নিশ্চিত
কাঙাল কুকুর হয়ে মাঝে মাঝে আমি বড় মিলন প্রত্যাশী।।

সাবধান

আমি সেই মানুষ, আমাকে চেয়ে দ্যাখো
আমি ফিরে এসেছি
আমার কপালে রক্ত;
বাষ্প-জমা গলায় বাস-ওল্টানো ভাঙা রাস্তা দিয়ে
ফিরে এলাম-
আমি মাছহীন ভাতের থালার সামনে বসেছি
আমি দাঁড়িয়েছি চালের দোকানের লাইনে
আমার চুলে ভেজাল তেলের গন্ধ
আমার নিশ্বাস-।

রাস্তায় একটা বাচ্চা ছেলে বমি করলো
আমি ওর মৃত্যুর জন্য দায়ী-
পিছনের দরজায় বস্তাভর্তি টাকা ঘুষ নিচ্ছিল যে লোকটা
আমি তার হত্যার জন্য দায়ী-

আমি পুলিশের বোকামি দেখে প্রকাশ্যে হাসাহাসি করবো
আমি নেহেরুর উইল সম্পর্কে শুনবো ট্রামের লোকের ইয়ার্কি
কম্যুনিষ্টদের শ্লোগানের শবযাত্রা দেখে আমার দয়াও হবে না;
আমি ভয়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে জেগে উঠবো মমতায়
আমি মেয়েটির কাছে গিয়ে নিঃশব্দে মুখ চুম্বন করবো
সশরীরে বিছানায় শুয়ে দু'জনে কাঁদবো নানা ধরনে
পরদিন ঠিকঠাক বেঁচে উঠতে হবে, এই জেনে।

আমার গলা পরিস্কার, আমি স্পষ্ট করে কথা বলবো
সমস্ত পৃথিবীর মেঘলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ
ক্রোধ ও কান্নার পর স্নান সেরে শুদ্ধভাবে
আমি
আজ উচ্চারণ করবো সেই পরম মন্ত্র
আমাকে চাঁচাতে না দিলে এ পৃথিবীও আর বাঁচবে না।

স্বপ্ন, একুশে ভাদ্র

কোন্ দিকে? কোন্ দিকে? আমি চিৎকার করলাম
অমনি ভিড়ের ভিতরে
একটা মোহর এসে ছিট্‌কে পড়লো। তৎক্ষণাৎ নৈঋত বাদ দিয়ে
সাতদিকে সাতটা রাস্তা খুলে গেল জ্যোৎস্নায়
বড় চিত্তহারী সেই পথগুলি এবং জ্যোৎস্নায়
ভিড়ের প্রতিটি টুকরো শত শত হুইস্‌ল বাজিলে ছুটে গেল
ব্যক্তিগত পথে পথে। কোন্ দিকে? কোন্ দিকে?
আমি তীব্র ধাবমান
কয়েকটি কলার চেপে হেঁকে উঠি, কী-করে জানলেন এইটা ঠিক

পথ? নাকি যে-কোন রাস্তায়?
তাদের উত্তরঃ পথ ও রাস্তার মধ্যে বহু ভেদ আছে, ইডিয়ট!
পথ কিংবা রাস্তা আমি কোন্‌টায় নামবো বহু ভেবে শেষটায়
পথেই নামলুম। কেননা 'পথিক' এই সুদূর শব্দটি
বড়ই রোমাঞ্চকর। তার বদলে 'রাস্তার লোকটা' ?
পরমুহূর্তেই হায়, কয়েকশত প্রেমিক ও
কবিদের স'তি, উপমার
ভয়ংকর নেকড়েগুলি ছিঁড়ে চুষে খেয়ে ফেললো
আমার শরীর রক্ত দু'চোখের মণি।।

স্মৃতির প্রতি

বড় ঠাণ্ডা লাগে স্মৃতি, এ যেন কেমন এক চতুষ্কোণ দ্বীপে শুয়ে থাকা
চতুর্দিকে এক সুবাতাস,
এত প্রজাপতি দেখলে দুদিনের জন্য ভয় হয়।
আলো টলমল করে অস্তিম শিয়রে, আরও একটু কম আলো
গোলাপবাগানে কুঁকলে সহনীয় হতো।
কত রাত ঘুম আসেনি, কত রাত ডুবে গেছি। বিষম কঠিনতম ঘুমে
কি জানি কেমন তন্দ্রাঘোরে!
জানলার ঝিলমিলিতে অথবা কার্নিসে কত স্বপ্ন গুটি মেরে
প্রতীক্ষায় ছিল, তারা পাল্লাবে আসন পায়নি, ফিরে গেছে,- আজ
সেই সব না দেখা স্বপ্ন ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিতে চায়; আঃ!
চতুর্দিকে এত সুবাতাস–
এত প্রজাপতি দেখলে দুদিনের জন্য ভয় হয়!
বড় ভয় লাগে ওই ওষ্ঠ ধরে অসহ অমিয়

গ্রীবার একটু নিচে নখের আঁচড় দেখলে বজ্রপাত,রক্তবৃষ্টি হয়
হঠাৎ এগারোটায় চকিতের জন্য কেন নীরা তুমি, ফিরে এলে সার্কুলার রোডে?

আজ আমি জনতার, আজ আমি পলাতক চতুষ্কোণ দ্বীপে।

তিনজন একসঙ্গে লাইব্রেরির মাঠে বসেছি, তিনজন উনিশ,
এখন সজ্জিত মঞ্চ ঢের ভালো তিন দৃশ্যে তিন হত্যাকারী,
সামান্য পিঁপড়েও আজ রক্ত চেনে, চোখের মণিকে খুব সুখাদ্য জেনেছে,
আমার বোতাম নেই, সেফটিপিন কিনতে গিয়ে হঠাৎ ফুটপাথে হিরন্ময়
কাঠ হয়ে মরে রইলো, আমি তার আততায়ী,–আমি নয়, আমি?
আমি নয়, আমি নয়, মুক্তি দাও হিরন্ময়, জানো, আমি নয়!
যাকে হত্যা করতে চাই,...তারা সব আগে থেকে হঠাৎ ফুটপাথে
এখন আমার ভয় প্রজাপতি ফুলের বাগানে
যারা তার থেকে আরও দূরে আছে তাদের ডাক-নাম ভুলে গেছি।

হঠাৎ নীরার জন্য

বাস স্টপে দেখা হলো তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল
স্বপ্নে বহুক্ষণ
দেখেছি ছুরির মতো বিঁধে থাকতে সিন্ধুপারে–দিকচিহ্নহীন–
বাহান্ন তীর্থের মতো এক শরীর, হাওয়ার ভিতরে
তোমাকে দেখছি কাল স্বপ্নে, নীরা, ওষধি স্বপ্নের
নীল দুঃসময়ে।

দক্ষিণ সমুদ্রদ্বারে গিয়েছিলে কবে, কার সঙ্গে? তুমি
আজই কি ফিরেছো?

স্বপ্নের সমুদ্র সে কী ভয়ংকর, ঢেউহীন, শব্দহীন, যেন
তিনদিন পরেই আত্মঘাতী হবে, হারানো আঙটির মতো দূরে
তোমার দিগন্ত, দুই উরু ডুবে কোনো জুয়াড়ির সঙ্গিনীর মতো,
অথচ একলা ছিলে, ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা।

এক বছর ঘুমোবো না, স্বপ্নে দেখে কপালের ঘাম
ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়
বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা
নগ্ন শরীরের মতো লজ্জাহীন, আমি
এক বছর ঘুমোবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে
বাহান্ন তীর্থের মতো তোমার ও-শরীর ভ্রমণে
পুণ্যবান হবো।

বাসের জানালার পাশে তোমার সহাস্য মুখ, ‘আজ যাই,
বাড়িতে আসবেন!’

রৌদ্রের চিৎকারে সব শব্দ ডুবে গেল।
‘একটু দাঁড়াও’, কিংবা ‘চলো লাইব্রেরির মাঠে’, বুকের ভিতরে
কেউ এই কথা বলেছিল, আমি মনে পড়া চোখে
সহসা হাতঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি, রাস্তা, বাস, ট্রাম, রিকশা, লোকজন
ডিগবাজির মতো পার হয়ে, যেন ওরাং উটাং, চার হাত-পায়ে ছুটে
পৌঁছে গেছি আফিসের লিফ্‌টের দরজায়।

বাস স্টপে তিন মিনিট, অথচ তোমায় কাল স্বপ্নে বহুক্ষণ।।

হাওয়া এসে

নারী শুধু মুখ লুকোবার জন্য, যখন ঝর্ণায় দেখি মুখ
তখন নারীর কথা মনে পড়ে, হাওয়ায় কার্পাস ফুল ভেসে যায়;
হলুদ আঁচল মাখা যুবতীর পাশে বসে দেখি ঐ কার্পাসের ওড়াওড়ি।
নদীর সম্মুখ
ঢেকে গেছে কুয়াশায়, শোনা যায় বন্যা-রোধ কামানের তুড়ি
আঁচল সরিয়ে রাখি বুকে ঠাণ্ডা মুখ–
হাওয়া এসে কাপসের মতো নিয়ে যায় গাঙ্গেয় সভ্যতা
‘নারীকেও নিয়ে যায়’ !

হিমযুগ

শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূর চলে গিয়ে ফিরে আসি শরীরের কাছে
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে-
শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোঃস্নার মতো যোনি
মধুকূপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা খয়েরি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে-

আমার নিশ্বাস পড়ে দ্রুত, বড়ো ঘাম হয়, মুখে আসে স’তি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।
নয় ক্রুদ্ধ যুদ্ধ, ঠোঁটে রক্ত, জঙ্ঘার উত্থান, নয় ভালোবাসা
ভালোবাসা চলে যায় একমাস সতোরো দিন পরে
অথবা বৎসর কাটে, যুগ, তবু সভ্যতা রয়েছে আজও তেমনি বর্বর
তুমি হও নদীর গর্ভের মতো, গভীরতা, ঠান্ডা, দেবদূতী
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।

মৃত শহরের পাশে জেগে উঠে দেখি আমার প্লেগ, পরমাণু কিছু নয়,

স্বপ্ন অপছন্দ হলে পুনরায় দেখাবার নিয়ম হয়েছে
মানুষ গিয়েছে মরে, মানুষ রয়েছে আজও বেঁচে
ভুল স্বপ্নে, শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনী
তুমি কথা দিয়েছিলে.... .
এবার তোমার কাছে হয়েছি নিঃশেষে নতজানু
কথা রাখো! নয় রক্তে অশ্বখুর, স্তনে দাঁত, বাঘের আঁচড় কিংবা
ঊরুর শীৎকার
মোহমুগ্ধরের মতো পাছা আর দুলিও না, তুমি হৃদয় ও শরীরে ভাষ্য
নও, বেশ্যা নও, তুমি শেষবার
পৃথিবীর মুক্তি চেয়েছিলে, মুক্তি, হিমযুগ, কথা দিয়েছিলে তুমি
উদাসীন সঙ্গম শেখাবে।।